ম্যারেজ রেজিস্টার

নিমাই ভট্টাচার্য

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ।। ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ।। কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৬০
আষাঢ় ১৩৬৭
প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯
প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়
মুদ্রক
দুর্গাপদ ঘোষ
শ্রীঅরবিন্দ প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৬

পরম শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীসুনীলকুমার রায়

শ্রদ্ধাভাজনেষু -

এই লেখকের অন্যান্য বই

মেমসাহেব
ডিপ্লোম্যাট
রাজধানীর নেপথ্যে
ভি-আই-পি
যৌবন নিকুঞ্জে
অনুরোধের আসর
তোমাকে
হকার্স কর্ণার
কেয়ার অব ইণ্ডিয়ান এম্বাসী
ভায়া ডালহৌসী
সেলিম চিস্তি
রিপোর্টার
চিড়িয়াখানা
প্রবেশ নিষেধ
ডিফেন্স কলোনী
এ-ডি সি
ইমন কল্যাণ
কেরানী
ব্যাচেলার
গোধূলিয়া
লাষ্ট কাউণ্টার
ইনকিলাব
প্রিয়বরেষু
সাব-ইন্সপেক্টর
পিকাডিলী সার্কাস
রবিবার
সোনালী
পেন ফ্রেণ্ড এ্যাণ্ড ক্লাশ ফ্রেণ্ড
মোগলসরাই জংশন
ওয়ান আপ—টু ডাউন
আকাশ ভরা সূর্যতারা
হরেকৃষ্ণ জুয়েলার্স
ককটেল
ম্যাডাম
নিমন্ত্রণ
ইওর অনার
ভালোবাসা
ডার্লিং
শেষ পারানির কড়ি
রাজধানী এক্সপ্রেস
বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত
পার্লামেণ্ট স্ট্রীট
উইং কমাণ্ডার
নাচনী
ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র
অন্যদিন

বিঃ দ্রঃ অনুভব, হরেরাম হরেকৃষ্ণ এবং এয়ার হোস্টেস আমার লেখা নয়।

নি. ভ.

MARRIAGE REGISTRAR

A BENGALI NOVEL

BY

NIMAI BHATTACHARYYA

PRICE Rs. EIGHT ONLY

রবিবার বিকেলে দোতলার বারান্দায় সাইনবোর্ড ঝোলান হলো—রমেন্দ্রনাথ সোম, ম্যারেজ রেজিস্টার। বড় বড় অক্ষরে এই লেখাগুলির নীচে ছোট অক্ষরে লেখা—এখানে ১৯৫৪ সালের স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুসারে বিবাহ দেওয়া হয়।

চব্বিশ ঘণ্টা পার হতে না হতেই খুব জোরে কলিং বেল বেজে উঠল। রমেনবাবু তাড়াতাড়ি দরজা খুলতেই একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, মিঃ সোম আছেন ?

হঠাৎ আনন্দে উত্তেজনায় রমেনবাবুর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, আমিই মিঃ সোম।

আমি এসেছিলাম বিয়ের নোটিশ দিতে।

কিন্তু আপনি একা তো নোটিশ দিতে পারবেন না।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, না না, একা নোটিশ দেব না। সুমিত্রা নীচে অপেক্ষা···

ওঁকে ডেকে আনুন।

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। রমেনবাবুও প্রায় দৌড়ে ভিতরের ঘরে গিয়ে ওঁর স্ত্রী সাবিত্রীকে বললেন, সাবি, এক ভদ্রলোক বিয়ের নোটিশ দিতে এসেছেন। তুমি তাড়াতাড়ি তিন কাপ চা কর।

সাবিত্রী সেলাই করছিল। মুখ না তুলেই হাসতে হাসতে বললো, দেখে মনে হচ্ছে তুমিই বিয়ে করবে।

স্ত্রীর কথায় মিঃ সোম একটু হাসেন কিন্তু কোন কথা না বলেই তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে যান। আলমারী থেকে স্পেশ্যাল ম্যারেজ আইনের ৫নং ধারা অনুযায়ী বিয়ের নোটিশ দেবার একটা ফর্ম বের করেন। টেবিলটা একটু ঠিকঠাক করেন। দুটো চেয়ার একটু কাছে টেনে আনতে না আনতেই আবার কলিং বেল বাজে।

মিঃ সোম তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেন। না, ওরা না। গোয়ালা দুধ দিতে এসেছে। অন্য দিন তিরিশ বছরের পরিচিত এই গোয়ালাকে দেখেই ভাল লাগত কিন্তু আজ ওকে দেখেই মিঃ সোমের মেজাজ বিগড়ে গেল। বেশ একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, যাও, যাও, ভিতরে যাও। যাতায়াতের রাস্তা আটকে বসো না।

গোয়ালা চলে যাবার পর পরই আবার বেল বাজল। মিঃ সোম দরজা খুলতেই দেখলেন, সেই ভদ্রলোক আর একজন ভদ্রমহিলা। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আসুন—আসুন।

ওঁরা দুজনে মিঃ সোমের পিছন পিছন বাইরের ঘরে এলেন। বসলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাবিত্রী চা নিয়ে এলেন।

ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই ভদ্রমহিলা বললেন, আমরা এখুনি চা খেয়ে এলাম।

সাবিত্রী ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলার উপর দিয়ে দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে বললেন, তাতে কী হলো? করেছি যখন, খেয়েই নিন।

সাবিত্রী ভিতরে চলে যেতেই মিঃ সোম বললেন, আমি ম্যারেজ অফিসার হবার পর আপনারাই প্রথম এলেন।

ভদ্রলোক বললেন, তাই নাকি?

হ্যাঁ।

তাহলে তো আমরা খুব লাকী।

মিঃ সোম হাসতে হাসতে বললেন, আপনাদের চাইতে আমি বেশী লাকী।

ওঁরা হাসেন।

চা খেতে খেতেই মিঃ সোম জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নামটা জানতে পারি কী?

নিশ্চয়ই। আমি প্রবীর ব্যানার্জী আর ওর নাম সুমিত্রা সরকার।

মিঃ সোমের মুখের হাসি তখনও মিলিয়ে যায়নি। বললেন, দেখে মনে হয়, আপনারা দুজনেই কলেজের প্রফেসর।

মিঃ ব্যানার্জী একটু হেসে বললেন, আমরা দুজনেই এম. এ. পাস করেছি কিন্তু কেউই কলেজে পড়াই না। আমি এল. আই. সী.-তে আছি আর সুমিত্রা একটা স্কুলে পড়াচ্ছে।

সুমিত্রা একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, একদিন দুজনেই অধ্যাপক হবার স্বপ্ন দেখতাম কিন্তু মানুষ যা চায় তা সে কখনই পায় না।

মিঃ সোম বললেন, বোধহয় আমরা সেভাবে মন-প্রাণ দিয়ে চাইতে পারি না বলেই···

ওঁকে পুরো কথাটা বলতে না দিয়েই মিঃ ব্যানার্জী বললেন, মন-প্রাণ দিয়ে চাইলেও অনেক সময় অনেক কিছুই পাওয়া যায় না। এবার একটু হেসে বললেন, আজ থেকে কুড়ি বছর আগে আমাদের বিয়ে হাওয়া উচিত ছিল কিন্তু পেরেছি কী?

এ তো ভাগ্যের পরিহাস!

এবার সুমিত্রা বললেন, ঐ ভাগ্যের দোহাই দিয়েও সবকিছু মেনে নেওয়া সহজ নয়।

চা খাওয়া শেষ। এবার মিঃ সোম ১৯৫৪ সালের স্পেশ্যাল ম্যারেজ অ্যাক্টের সেকেণ্ড সিডিউলের ৫নং ধারা নোটিশ অব ইনটেনডেড ম্যারেজ-এর ফর্ম মিঃ ব্যানার্জীর সামনে এগিয়ে দেন।

ফর্মের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মিঃ ব্যানার্জী এবার পকেট থেকে কলম বের করে লিখতে শুরু করেন· পাত্রের নাম—শ্রীপ্রবীর-কুমার ব্যানার্জী, কণ্ডিসন—আনম্যারেড, অকুপেশন—সার্ভিস, বয়স—৪২, ডোয়েলিং প্লেস—৩।৫।১এ, ক্ষেত্রমোহন নস্কর রোড, কলিকাতা ৪০, লেনথ অব রেসিডেন্স—১২ বছর।

এবার উনি পাত্রীর বৃত্তান্ত লিখতে শুরু করেন। পাত্রীর নাম—শ্রীমতী সুমিত্রা সরকার, কণ্ডিসন—উইডো, অকুপেশন—সার্ভিস···

পাত্রীর বৃত্তান্ত লেখা শেষ হতেই মিঃ সোম ওঁকে বললেন, আগে ব্রাইড সই করবেন, তার নীচে আপনি সই করবেন।

ওঁরা দুজনে সই করার পর মিঃ সোম ফর্মটা হাতে নিয়েই বললেন, আপনাদের দুজনের হাতের লেখাই অপূর্ব।

মিঃ সোমের কথায় ওঁরা দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলেন।

হাসলেন কেন? মিঃ সোম ওঁদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন।

প্রবীর হাসতে হাসতে সুমিত্রাকে বললেন, বলো, হাসলে কেন।

সুমিত্রার মুখেও হাসি। বললেন, আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই তখন কেউ কাউকে চিনতাম না। এই হাতের লেখার জন্যই আমাদের প্রথম আলাপ হয়।

মিঃ সোম বললেন, ভেরী ইণ্টারেস্টিং।

প্রবীর কথা বলেন না। সুমিত্রা বললেন, শুরুতে সত্যি খুব ইণ্টারেস্টিং মনে হয়েছিল কিন্তু পরে তার জন্য দুজনকেই অনেক খেসারত দিতে হয়।

এবার প্রবীর বললেন, ফর্ম দেখেই বুঝতে পারছেন, সুমিত্রার বিয়ে হয়েছিল এবং···

মিঃ সোম বললেন, এখন আর ওসব পুরনো কথা মনে করে কী লাভ? যা হবার তা তো হয়েই গেছে, এখন···

সুমিত্রা বললেন, এমন দিনে যদি সব কথা মনে না পড়ে তাহলে আর কবে পড়বে? উনি একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমার বাবা অত্যন্ত বদমেজাজের লোক ছিলেন। আমার মায়ের কাছ থেকে উনি আমার মনের কথা জানতে পেরেই—

সুমিত্রা ঘরে ঢুকতেই ওর বাবা দরজা বন্ধ করে দিলেন। ড্রয়ার থেকে রিভলবার বের করে টেবিলের উপর রাখলেন। তারপর সোজা-সুজি মেয়ের দিকে তাকিয়ে গিরীশবাবু বললেন, শুনে রাখো সুমি, আমার জীবিতকালে যদি তুমি নিজের খেয়ালখুশি মতো বিয়ে কর, তাহলে তোমার বিয়ের আসরে আমি আত্মহত্যা করব।

সুমিত্রা মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

গিরীশবাবু আবার বললেন, আমি জীবিত থাকতে আমাদের বংশে এসব কেচ্ছাকেলেঙ্কারি হতে পারবে না।

গিরীশবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে সুমিত্রা নিজের ঘরে যেতেই ওর মা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, উনি কী বললেন ?

রাগে, দুঃখে, ঘেন্নায় সুমিত্রা মুখ ঘুরিয়ে বললো, তুমি যে কী করে এই গুণ্ডা স্বামীকে এতকাল বরদাস্ত করলে, তা আমি ভেবে পাই না। এমন স্বামীর সঙ্গে আমার বিয়ে হলে হয় আমি তাকে মার্ডার করতাম, নয়তো আমি নিজে আত্মহত্যা করে মরতাম।

গিরীশবাবুর স্ত্রীর মুখ দিয়ে একটা শব্দ বেরোয় না।

সুমিত্রা বলে, আজ তোমাকে বলে রাখছি, বাবা জোর করে আমার বিয়ে দিলেও প্রবীরকে বিয়ে না করে আমি মরব না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মিঃ সোম জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কী হলো ?

প্রচুর টাকা ব্যয় করে একটা অপদার্থের সঙ্গে বাবা আমার বিয়ে দিলেন।

তিনি কী করতেন ?

সাদা প্যাণ্ট কালো কোট পরে কোর্টে যেতেন আর শ্বশুরের টাকায় রোজ বোতল বোতল মদ খেতেন।

মিঃ সোমের মুখ একটু বিকৃত হয়। মুখে কোন প্রশ্ন করেন না।

সুমিত্রা বললেন, অত মদ খাবার ফলে সিরোসিস অব লিভার হয়ে ভদ্রলোক তিন বছর পরই মারা গেলেন।

এবার প্রবীর বললেন, সতের বছর পরে হঠাৎ মাসখানেক আগে বর্ধমান স্টেশনে আমার সঙ্গে সুমিত্রার দেখা হলো।

বর্ধমান লোক্যাল ছাড়তে তখনও দেরী আছে। অপরাহ্ণবেলার গাড়ি। যাত্রীর ভীড় নেই বললেই চলে। প্রবীরবাবু একটা ফাঁকা কম্পার্টমেণ্টের জানলার ধারে বসলেন। এক ভাঁড় চা খেলেন। তারপর একটু বিশ্রাম করবেন বলে পায়ের জুতো খুলে সামনের বেঞ্চিতে পা দুটো ছড়িয়ে দিলেন।

দু'-পাঁচ মিনিট কেটে গেল। তারপর হঠাৎ ছোটবেলার কথা মনে পড়ল প্রবীরবাবুর। মার কথা, বাবার কথা, ছোট ভাই সুবীরের কথা। প্রথম রেলগাড়ি চড়ে কাশী যাবার কথা।

জীবনের প্রথম রেলগাড়ি চড়ার আনন্দের কথা, উত্তেজনার কথা মনে করেই প্রবীরবাবুর একটু হাসি পায়।···

সুবীর দু'হাত দিয়ে মার মুখখানা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, আচ্ছা মা, দাদা বলছে সাহেব না হলে রেলগাড়ি চালাতে দেয় না; সত্যি কী?

মা সুবীরের জামার বোতামগুলো ঠিক করে লাগাতে লাগাতে বললেন, বড় বড় গাড়ি সাহেবরাই চালায়।

আচ্ছা মা, দাদা বলছিল, যেসব সাহেবরা গাড়ি চালায় তারা বলে খুব মোটা আর রাগী হয়।

মা কোনমতে হাসি চেপে বলেন, বোধহয়।

আচ্ছা মা রেলগাড়ি জোরে চলে না কি জাহাজ?

রেলগাড়ি।

সুবীর দাদার গভীর জ্ঞানের প্রমাণ পেয়ে মুগ্ধ হয়। বলে, তাহলে দাদা ঠিকই বলেছে।

সুবীর ছোটবেলায় বড্ড বেশী বকবক করতো। মিনিটে মিনিটে প্রশ্ন করতো দাদাকে। হেরে যাবার ভয়ে আর বড় ভাইয়ের সম্মান বজায় রাখার লোভে প্রবীর ওর প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিত।

বর্ধমান লোক্যালের প্রায় ফাঁকা কম্পার্টমেণ্টে বসে সেসব দিনের কথা ভাবতে বেশ লাগে প্রবীরবাবুর। খুশীর হাসি ছড়িয়ে পড়ে

সারা মুখে। তারপর হঠাৎ সে খুশীর হাসি উবে যায়। মন বিষণ্ণ হয়। মার মৃত্যু, বাবার মৃত্যু, সুবীরের বিদেশ যাওয়া—সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেল।

তারপর ?

তারপরের দিনগুলোর কথা ভাবতে গিয়েই সুমিত্রার কথা মনে পড়ে প্রবীরবাবুর।···

সুমিত্রা প্রবীরের একটা হাতের উপর নিজের হাতে রেখে বলে, দুঃখ করবে না। বাবা-মা কি চিরকাল থাকেন ?

—না, তা থাকেন না কিন্তু···

সুমিত্রা একটু হেসে বলে, সূর্যমুখী বা পদ্মের মতো সব ফুল কি দীর্ঘজীবী হয় ? হয় না। অনেকেই শিউলির মতো সাত সকালে ঝরে পড়ে কিন্তু তাই বলে কি শিউলির মাধুর্য বা সৌরভ কম ?

সুমিত্রার কথায় প্রবীর মুগ্ধ হয়। বলে, সত্যি তুমি এত সুন্দর কথা বলো যে তোমাকে কাছে পেলে অনেক দুঃখই আমি ভুলে যাই।

—তোমার কাছে এলে আমিও আমার দুঃখ ভুলে যাই।

—জানো সুমিত্রা, আমার এম. এ. পড়ার একটুও ইচ্ছা ছিল না কিন্তু বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে ভর্তি হয়ে যাই। এখন মনে হয়, তোমার দেখা পাব বলেই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছিলাম।

—কি জন্য ভর্তি হয়েছ, তা জানতে চাই না। তবে তুমি ফার্স্ট ক্লাস না পেলে আমার সর্বনাশ।

—কেন ?

—কেন আবার ? সবাই বলবে, আমার পাল্লায় পড়ে তোমার পড়াশুনা হলো না।

প্রবীরবাবুর কামরায় আরো দু-চারজন যাত্রী উঠেছেন। ঘড়ির কাঁটা আরো একটু এগিয়েছে কিন্তু সেসব দিকে ওঁর খেয়াল নেই। উনি অতীত স্মৃতি রোমন্থন করতে বিভোর।···

সুমিত্রা বেশ উত্তেজিত হয়েই বললো, জানো কাল সুবীর কী কাণ্ড করেছে ?

—কী ?

—আমি মার জন্য একটু ফল কিনতে লেকমার্কেট গিয়েছিলাম। হঠাৎ কানে এলো, একটা ছেলে বৌদি বৌদি করে চিৎকার করছে। ··

—তারপর ?

সুমিত্রা হাসতে হাসতে বলে, আমি তো কল্পনাও করতে পারিনি, কেউ আমাকে বৌদি বলে ডাকতে পারে। তাই ওদিকে নজরও দিইনি।

প্রবীরও হাসছে। হাসতে হাসতে সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে আছে।

সুমিত্রা বলে, তারপর হঠাৎ দেখি সুবীর একদল বন্ধুকে নিয়ে আমাকে প্রায় ঘিরে ফেলে বলছে— ··

তুমি তো আচ্ছা লোক !

কেন ? কী করলাম ?

এতবার ডাকলাম ; তবু জবাব দিলে না ?

কই আমি তো শুনতে পাই নি !

ষাঁড়ের মতো চিৎকার করে ডাকছি বৌদি বৌদি আর তুমি শুনতে পাওনি ?

সুবীর, তুই একটা থাপ্পড় খাবি।

কেন ?

বাজারের মধ্যে বৌদি বৌদি করবি কেন ?

তবে কি তোমাকে মাসীমা বা দিদিমা বলে ডাকব ?

এতক্ষণ শোনার পর প্রবীর হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, তারপর কী হলো ?

—ওরা সবাই ধরল, বৌদি, আইসক্রীম খাব।···

—খাওয়ালে ?

—না খাওয়ালে ওরা আমাকে বাড়ি ফিরতে দিত ?

বর্ধমান লোক্যাল ছাড়ার সময় আরো এগিয়ে এসেছে কিন্তু প্রবীরবাবুর সেদিকে খেয়াল নেই। উদাস দৃষ্টিতে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে থাকেন আর মনে মনে সেইসব সোনালী দিনের কথা মনে করেন। বেশ খানিকটা দূরে, প্ল্যাটফর্মের ওদিকে, হঠাৎ একটা নারী-মূর্তি দেখে উনি চমকে ওঠেন।

কে ?

সুমিত্রা ?

না, না, সুমিত্রা এখানে কেমন করে আসবে ? কেন আসবে ?

অসম্ভব।

কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যেই সব তর্ক-বিতর্কের অবসান হলো।···

সুমিত্রা !

কে ? প্রবীর ?

তুমি এখানে ?

সুমিত্রা একটু ম্লান হাসি হেসে বললো, ওসব কথা পরে হবে। আগে বলো, কেমন আছো ?

প্রবীরও একটু হাসে। বলে, খুব ভাল।

স্ত্রী ? ছেলেমেয়ে ? সবার কী খবর ?

সবাই ভাল আছে।

তুমি কি বর্ধমানে থাকো ?

না।

তবে কোথায় ?

কলকাতায়।

কলকাতায় কোথায় ? ভাবানীপুরের বাড়িতেই ?

টালিগঞ্জে।

চেহারা এরকম বিশ্রী হয়েছে কেন ?

স্ত্রী যত্ন করে না।

কেন ?

কেন আবার? সতের বছর সে আমার দেখাশুনা করে না।

প্রবীর!

সুমিত্রা মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

দু-এক মিনিট কেউই কোন কথা বলে না। তারপর প্রবীর প্রশ্ন করে, তোমার কী খবর? তোমার স্বামী কি এখানেই থাকেন?

সুমিত্রা মুখ নীচু করেই খুব আস্তে আস্তে বললো, আমি একটা স্কুলে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলাম। আর আমার স্বামী বিয়ের তিন বছর পরই মারা গিয়েছেন।

সে কী!

অবাক হচ্ছো কেন? অত মদ গিললে কী কোন মানুষ বাঁচতে পারে?

তোমার ছেলেমেয়ে···

না প্রবীর, আমার কোন ছেলেমেয়ে নেই।

হঠাৎ লোকজনের কলকোলাহল শুনেই বোঝা গেল, ট্রেন ছাড়ার দেরী নেই। প্রবীর ওকে জিজ্ঞাসা করল, তুমিও কি কলকাতা যাবে?

হ্যাঁ।

তাহলে চলো ট্রেনে উঠি। ট্রেন ছাড়ার বোধহয় আর দেরী নেই।

চলো।

এতক্ষণ চুপ করে শোনার পর মিঃ সোম প্রশ্ন করলেন, এতদিন আপনারা কেউ কারুর কোন খবরও রাখতেন না?

না।

এতকাল বিয়ে করেননি কেন?

প্রবীর একটু হেসে বললেন, করতে পারিনি। একটু থেমে বললেন, তাছাড়া সব সময়ই মনে হতো, সুমিত্রা একদিন নিশ্চয়ই আমার কাছে আসবে।

যাই হোক ম্যারেজ অফিসার হিসেবে আপনাদের পেয়ে আমি খুব খুশী। ভগবান এবার নিশ্চয়ই আপনাদের সুখী করবেন।

প্রবীর পার্স থেকে নোটিশ দেবার ফি পাঁচ টাকার একটা নোট বের করে বললেন, মাস খানেক পরে আবার আসব।

নিশ্চয়ই আসবেন।

দিন তিনেক পরের কথা। বিকেলবেলার দিকে একদল ছেলে আর একটা মেয়ে এসে হাজির। মেয়েটির বয়স নিঃসন্দেহে আঠারোর অনেক বেশী। তাই ব্যাপারটা একটু গোলমেলে মনে হলেও মিঃ সোম কিছু বললেন না। বিয়ের নোটিশ দেবার ফর্ম বের করার আগেই উনি জিজ্ঞাসা করলেন, উড বী ব্রাইডগ্রুম কে ?

পিছন থেকে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটা ছেলে সামনে এগিয়ে এসে বললো, আমি।

আপনার নাম ?

দিলীপ ঘোষ।

এবার মেয়েটিকে দেখিয়ে মিঃ সোম জিজ্ঞাসা করলেন, এই মেয়েটিকে আপনি বিয়ে করতে চান ?

হ্যাঁ।

ওঁর নাম কী ?

মায়া বসু।

ইনি আপনার আত্মীয়া কী ?

না, না।

কোন কোন আত্মীয়ার সঙ্গে বিয়ে হয় না জানেন ?

না, ঠিক জানি না।

মিঃ সোম সঙ্গে সঙ্গে ১৯৫৪ সালের স্পেশ্যাল ম্যারেজ অ্যাক্টের চটি বইখানা বের করেই বললেন, ছেলেরা কাকে কাকে বিয়ে করতে

পারে না শুনে নিন।

দু-তিনটি ছেলে একসঙ্গে বললো, বলুন, বলুন।

মিঃ সোম বললেন, সাঁইত্রিশজন আত্মীয়াকে ছেলেরা বিয়ে করতে পারে না। তারা হচ্ছেন—মা, বাবার বিধবা স্ত্রী অর্থাৎ বিমাতা, মার মা, মার বাবার বিধবা অর্থাৎ স্টেপ গ্রাণ্ড মাদার, মার মার মা, মার মার বাবার বিধবা অর্থাৎ…

হঠাৎ কটি ছেলে হেসে উঠল। ঐ ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন ছেলে বললো, দাদু, মায়াকে দেখে কি দিলীপের দিদিমা ঠাকুমা মনে হচ্ছে?

ছেলেটির কথায় ওরা সবাই হেসে উঠল।

মিঃ সোম একটু শুকনো হাসি হেসে বললেন, মনে না হলেও আইনের ব্যাখ্যা করা আমার কর্তব্য।

দিলীপ বললো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমাদের মধ্যে কোন আত্মীয়তা নেই। মায়ারা আমাদের বাড়িতে ভাড়া থাকে।

ভাড়াটে বা বাড়ির মালিক, তাতে আমার কিছু আসে-যায় না। এবার মিঃ সোম একটু হেসে বললেন, যে কোন একুশ বছরের ছেলে আঠারো বছরের যে কোন মেয়েকেই বিয়ে করতে পারে, তবে বিয়ে হবে না যদি ছেলেটির স্ত্রী জীবিত থাকে যদি সে উন্মাদ বা জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন হয়, যদি…

দিলীপ বললো, আমাদের একটু তাড়া আছে। যদি এবার ফর্মটা দেন…

মিঃ সোম সঙ্গে সঙ্গে একটা ফর্ম এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই নিন।

দিলীপ সঙ্গে সঙ্গে ফর্মে ওদের নাম-ধাম লিখতে শুরু করল। সবকিছু লেখা হবার পর দুজনে সই করল। মিঃ সোম ফর্মটি হাতে নিয়ে বললেন, কোন ভুল বা মিথ্যা বৃত্তান্ত থাকলে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১৯৯ ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত…

দিলীপ বললো, সব ঠিক আছে।

তিরিশ দিনের মধ্যে কোন আইনসঙ্গত আপত্তি না উঠলে তার পর এলেই আপনাদের বিয়ে হতে পারবে।

দিলীপ এবার ওর বন্ধুদের বললো, তোরা একটু বাইরে যা।

বন্ধুর দল বাইরে যেতেই দিলীপ আর মায়া একটু এগিয়ে এসে দাঁড়াল। দিলীপ বললো, হাজার হোক আপনিই আমাদের বিয়ে দেবেন। আপনার কাছে কিছুই লুকোবার নেই। তাই বলছিলাম···

দিলীপ কথাটা শেষ না করেই মায়াকে ইশারা করে।

মায়া বলে, আমাদের এই বিয়েতে আপনাকে একটু সাহায্য করতে হবে।

মিঃ সোম বললেন, আইনের মধ্যে আমি সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত।

মায়া বলে, আমাদের এই বিয়েতে বাড়ির মত নেই বলে ··

তাতে কিছু হবে না।

এবার দিলীপ বললো, আমাদের এই বিয়ের খবরটা যদি বাইরের কেউ না জানতে পারে তাহলে···

আমি ব্যক্তিগতভাবে কাউকেই কিছু জানাব না; তবে যদি কেউ ম্যারেজ নোটিশ বুক দেখতে চান, তাহলে আমি দেখাতে বাধ্য। আর আমার দরজার পাশের নোটিশ বোর্ডে এই নোটিশের কপি লাগানো থাকবে।

দরজার পাশের নোটিশ বোর্ডে···

দিলীপকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মিঃ সোম মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, নোটিশ বোর্ডে নোটিশ লাগাতেই হবে; তবে তার জন্য আপনাদের ভয়ের কোন কারণ নেই।

দিলীপ একটু চিন্তিত হয়ে বললো, ভয় শুধু একটাই।

কীসের ভয়?

জানাজানি হয়ে গেলে মায়ার বাবা নিশ্চয়ই মায়াকে দূরে সরিয়ে দেবেন।···

আপনি তাহলে পুলিসের সাহায্য নেবেন।

পুলিসের সাহায্য নিতে চাই না।

কেন ?

মায়ার বাবা লোকাল থানায় কাজ করেন।

দিলীপ আবার মায়াকে চোখের ইশারা করল। এবার মায়া সঙ্গে সঙ্গে মিঃ সোমের পায়ের উপর পাঁচ-দশ টাকার কয়েকটা নোট রেখে প্রণাম করতেই উনি চমকে উঠলেন।

মায়া বললো, আপনার উপর আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করছে।

মিঃ সোম গোল করে পাকানো দশ টাকার নোটগুলো তুলে নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, আপনাদের সাহায্য করাই আমার কাজ। আমার সাহায্যের জন্য টাকা লাগবে না।

মায়া বলল, আমরা আপনার ভরসায় রইলাম।

মিঃ সোম একটু হেসে বললেন, আমি ভরসা দেবার কে ? ভরসা করুন ভগবানের উপর।

ওরা বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই মিঃ সোম বললেন, আমি একটা পাঁচ টাকার নোট নিয়ে নিয়েছি। বাকি টাকা নিয়ে যান।

দিলীপ বললো, প্রণামীর টাকা তো ফেরত নিতে নেই।

আমি কি ঠাকুর-দেবতা যে আমাকে প্রণামী দিচ্ছেন ? এ টাকা আপনারা নিয়ে যান।

না, না, এ টাকা আমরা নিতে পারব না।

না, না, তা হয় না। এ টাকা আপনারা ··

ওরা তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নামে। মিঃ সোম একটু জোরেই বলেন, পরের দিন এলে এ টাকা নিতেই হবে। নয়ত···

দিলীপ আর মায়া চলে যাবার পরই সাবিত্রী বাইরের ঘরে এসে মিঃ সোমকে জিজ্ঞাসা করলেন, চা খাবে ?

খাব।

সাবিত্রী রান্না ঘরে চা করতে যাবার পরই আবার কলিংবেল বাজল। মিঃ সোম দরজা খুলতেই দেখলেন চারজন বয়স্ক ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা। তাঁদের পিছনে ছটি ছেলেমেয়ে। একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিই কী মিঃ রমেন সোম ?

হ্যাঁ।

আমরা কি ভেতরে আসতে পারি ?

নিশ্চয়ই।

মিঃ সোম ওঁদের বাইরের ঘরে নিয়ে গেলেন। বসালেন।

এবার একজন প্রবীণ ভদ্রলোক বললেন, আমার নাম এস. কে. রায়চৌধুরী।

মিঃ সোম সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন।

এবার মিঃ রায়চৌধুরী অন্যদের পরিচয় করিয়ে দিলেন, মিসেস বাসু, মিসেস রায়চৌধুরী, ডাঃ বাসু, আমার ছেলে সুব্রত, আমার ভাবী পুত্রবধূ অঞ্জলি বসু।

ওঁদের সবার সঙ্গে পরিচয় হতেই মিঃ সোম খুশীর হাসি হাসেন।

ডাঃ বাসু বললেন, সুব্রত আর অঞ্জলি একসঙ্গে এঞ্জিনিয়ারিং পড়তো। এবারই পাস করল।···

খুব ভাল।

মিসেস বাসু বললেন, ওরা বিয়েতে বাজে টাকা খরচ না করে সেই টাকা দিয়ে কানাডায় যাবে বলেই···

মিঃ সোম সুব্রত আর অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে বললেন, এইতো চাই।

মিঃ রায়চৌধুরী বললেন, আমাদের একটা আর্জি আছে।

বলুন, বলুন।

আজ তো বিয়ের নোটিশ দিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিন্তু বিয়ের দিন আপনাকে একটু কষ্ট করে ডাঃ বাসুর বাড়িতে যেতে হবে।

নিশ্চয়ই যাব।

ডাঃ বাসু বললেন, কোন বড় অনুষ্ঠান আমরা করতে চাই না; তবে দু-চারজন আত্মীয়বন্ধুর সামনে শুভকাজ সম্পন্ন হলে…

এত করে বলার কোন প্রয়োজন নেই। আমি নিশ্চয়ই…

মিসেস রায়চৌধুরী বললেন, আমরা কেউ এসে আপনাকে নিয়ে যাব।

মিঃ সোম বললেন, তবে একটু আগে থেকে আমাকে জানাবেন, কবে কখন…

ডাঃ বাসু বললেন, এরপর এদিকে এলেই আমি নিজে আপনাকে জানিয়ে যাব।

মিঃ সোম ফর্ম বের করতে করতে বলেন, বাংলাদেশের মানুষ যদি আপনাদের মতো উদার ও আধুনিক হতো তাহলে কত গরীব মধ্যবিত্ত যে বেঁচে যেতো তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

ডাঃ বাসু হাসতে হাসতে বললেন, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা মুখেই ইনকিলাব-জিন্দাবাদ বলে চিৎকার করে কিন্তু পুরনো সংস্কার বিসর্জন দেবার সাহস তাদের নেই।

মিঃ সোম বললেন, তা ঠিক।

মিঃ রায়চৌধুরী ফর্মটা সুব্রতকে দিয়ে বললেন, এটা তোমরা ফিল-আপ করো।

সুব্রত আর অঞ্জলি ফর্ম নিয়ে ওপাশের টেবিলে চলে যেতেই মিঃ সোম জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি চা খাবেন?

ওঁরা দু-তিনজন একসঙ্গে বললেন, না, না, চায়ের দরকার নেই।

ওঁরা আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করেন না। অঞ্জলি আর সুব্রত ফর্ম ভরে দেবার পরই ওঁরা চলে যান।

ওঁরা চলে যাবার পরও রমেন সোম চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারেন না। কত কী ভাবেন, কত কী মনে পড়ে।

উনি মনে মনে আশা করেছিলেন, যারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সমাজের

মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহস করবে না, শুধু তারাই ওর কাছে বিয়ের জন্য আসবে কিন্তু এরা কজন এসে ওর চোখ খুলে দিলেন।

সত্যি হিন্দু সমাজে প্রত্যেকটি আনন্দোৎসব যেন এক একটা অভিশাপ। একটা শিশু জন্ম হবার পর থেকেই শুরু হয় উৎসব। ষষ্ঠী পূজা থেকে শুরু করে মরার পর শ্রাদ্ধ করেও তার শেষ নেই। প্রথম বছর মাসে মাসে শ্রাদ্ধ করতে হবে, তারপর বছর বছর। শাস্ত্র বলে, অবস্থা অনুযায়ী ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে হবে। তাই তো সীতা গয়ায় বালির পিণ্ড দিয়ে পিতৃপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পেরেছিলেন কিন্তু আজকের দিনে দীন দরিদ্রতম ব্যক্তিকেও সর্বস্ব খুইয়ে কিছু অনুষ্ঠান না করলে সে তার নিজের সমাজে টিকতে পারবে না।

মিঃ সোমের হঠাৎ মনে পড়ে অমর মামার কথা। নিজের ভিটে-মাটি ছেড়ে নিঃসম্বল অবস্থায় সপরিবারে এসে ঠাঁই নিয়েছেন রানাঘাটে। তারপর কাঁচড়াপাড়া। স্কুলে মাস্টারি না পেয়ে শেষ পর্যন্ত স্টেশনের ধারে একটা ছোট্ট চায়ের দোকান খুললেন। ঐ চায়ের দোকানের কেটলি, ডেকচি, কাপ-ডিশ, ইত্যাদি টুকটাক সরঞ্জাম কেনার জন্যও মামীর হাতের একটা চুড়ি বিক্রি করতে হয়।

ঐ চায়ের দোকান থেকে সারাদিনে যে দু-তিন টাকা আয় হতো তাই দিয়ে অমর মামার সংসারের ছ'টি প্রাণী কোনমতে অনাহারের হাত থেকে বাঁচছিলেন। বছরখানেকের মধ্যে আশেপাশে অনেক-গুলো দোকান আর দু-তিনটে কাঠের গোলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমর মামার চায়ের দোকান বেশ জমে উঠল। ঐ ছোট্ট চায়ের দোকান আস্তে আস্তে কাঁচড়াপাড়ার বিখ্যাত 'অমর কেবিন' হলো। তারপর পারিবারিক মর্যাদা সামাজিক কর্তব্য অনুযায়ী দুটি মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে অমর মামার হাত থেকে অমর কেবিন চলে গেল।

অমর মামার কথা মনে হতেই রমেন সোমের মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে—মানুষ বড় নাকি সামাজিক নিয়ম বড়?

আপন মনেই মিঃ সোম হাসেন। নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দেন, মানুষ মরুক কিন্তু সামাজিক নিয়ম ঠিক থাক।

হঠাৎ মনে হয়, অমর মামা যদি সর্বস্ব হারিয়ে মেয়ের বিয়ে না দিয়ে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টের ··

না, না, এ সাহস সবার হয় না ; হতে পারে না ! বাবা, ঠাকুর্দা, চোদ্দপুরুষের ধারা লঙ্ঘন করে এভাবে মেয়ের বিয়ে দেবার সাহস অমর মামার মতো মানুষের হতে পারে না কিন্তু ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, কলেজ-ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক, শিল্পী-সাহিত্যিক, জননেতা ? তারাও কি অমর মামার মতো ভীতু ? মেরুদণ্ডহীন ? নাকি এরা সবাই টাটা-বিড়লার মতো কোটিপতি ?

অনেক ভাবনা-চিন্তা করেও মিঃ সোম এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পান না। শুধু ভাবেন, তিরিশ-চল্লিশ টাকা ব্যয় করে যদি সব ছেলেমেয়ের বিয়ে হতো, তাহলে বোধহয় ভারতবর্ষের মানুষ গরীব থাকত না।

মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কলকাতা শহরে কত লক্ষ লক্ষ সাইনবোর্ড আছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

মিঃ সোম তাঁর ছোট্ট সাইনবোর্ড ঝোলাবার সময় স্বপ্নেও ভাবেননি, এটি এত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

সবার হাতে বইখাতা না থাকলেও ওদের দেখেই মিঃ সোম বুঝলেন ওরা সবাই ছাত্রছাত্রী। ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রেম-ভালবাসার পর বিয়ে হলে তাদের বন্ধুরা একটু বেশী উৎসাহী হবেই। বিয়ের নোটিশ দেবার সময় শুধু ছেলেটি ও মেয়েটির উপস্থিতি দরকার হলেও একালে বন্ধুবান্ধব আসা অস্বাভাবিক নয়।

মিঃ সোম হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি সবাই বিয়ে করবেন ?

ওঁর কথায় ছেলেমেয়েরা হেসে উঠল। দু-একটি ছেলেমেয়ের

দিকে ইশারা করে জানতে চায়, আমাদের কাউকে পছন্দ হয় ? মেয়েরা হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে বলে, না।

দুটি ছেলেমেয়ে মিঃ সোমের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। ছেলেটি বললো, আমরা বিয়ের নোটিশ দিতে এসেছি।

মুহূর্তের জন্য ওদের দিকে তাকিয়েই মিঃ সোম মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বললেন, আপনারা বসুন।

ওরা দুজনে প্রায় একসঙ্গে বললে, আমাদের আপনি বলবেন না। আমরা আপনার চাইতে অনেক ছোট।

মিঃ সোম একটু খুশির হাসি হেসে বললেন, আজকাল আর ছাত্র-ছাত্রীদের তুমি বলা নিরাপদ নয়।

ছেলেটি চেয়ারে বসে বললে, আপনি বোধহয় ঠিকই বলছেন, তবে আমাদের তুমি বললেই···

মেয়েটি বললো, আমরা তো আপনার প্রায় ছেলেমেয়ের বয়সী হবো।

মিঃ সোম কিছু বলার আগেই একটি ছেলে বললো, এটা কিন্তু লাভ ম্যারেজ নয় ; এ বিয়ে আমরা ঠিক করেছি।

মিঃ সোম অবাক হয়ে বললেন, তাই নাকি ?

এবার সামনের ছেলেটি বললো, আমাদের বন্ধুরাই এ বিয়ের ঘটকালি করেছে।

মিঃ সোম খুশিতে ঝলমল করে ওঠেন। বলেন, ভেরী গুড।

একটি মেয়ে আরেকটি মেয়েকে সামনে টেনে এনে বললো, এই ইন্দিরাই এ বিয়ের ঘটকালি করেছে।

ইন্দিরা হাতজোড় করে নমস্কার করল। বললো, আপনার সঙ্গে পাত্রপাত্রীর পরিচয় করিয়ে দিই।···

হ্যাঁ, হ্যাঁ।···

ইন্দিরা আলতো করে ছেলেটির কাঁধে হাত দিয়ে বললো, সুবীর মুখার্জী। মেয়েটিকে দেখিয়ে বললো, নন্দিতা ব্যানার্জী।

পঞ্জিকাতে কোন আইন লঙ্ঘন না করেই এদের বিয়ে ঠিক করা হয়েছে।

ইন্দিরার কথায় সবাই হাসেন।

আরো একটু কথাবার্তার পর সুবীর আর নন্দিতা ফর্ম ভর্তি করে, ফর্মের নীচে সই করে।

মিঃ সোম বললেন, বিয়ের দিন তোমরা সবাই আমার এখানে মিষ্টি খেয়ে যাবে।

মাসখানেক পরে এই ছেলেমেয়েরা আবার এসে হাজির। সুবীর আর নন্দিতা বর-বৌ-এর মতো সেজেছে। তুজনের কপালেই চন্দনের ফোঁটা। ইন্দিরার হাতে তুটি মালা।

মিঃ সোম ১৯৫৪ সালের স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টের থার্ড সিডিউলের ২১নং ধারা অনুযায়ী পাত্রপাত্রীর ডিক্লারেশন ফর্ম বের করলেন।

আই, শ্রীসুবীর মুখার্জী, হিয়ারবাই ডিক্লেয়ার অ্যাজ ফলোজ—

(১) আমি বর্তমানে অবিবাহিত,

(২) আমার বাইশ বছর বয়স হয়েছে,

(৩) কুমারী নন্দিতা ব্যানার্জীর সঙ্গে আমার নিষিদ্ধ সম্পর্কের আত্মীয়তা নেই,

(৪) আমি জানি এই ঘোষণায় মিথ্যা তথ্য থাকলে এবং···আমার জেল ও জরিমানা হতে পারে।

এর নীচে সুবীর মুখার্জী সই করল। অনুরূপ ঘোষণা করার পর নন্দিতাও সই করল। তারপর তিনজন সাক্ষী ও মিঃ সোম সই করলেন। তারপর ওঁর নির্দেশমতো সুবীর বললো, আই শ্রীসুবীর মুখার্জী টেক দি নন্দিতা ব্যানার্জী অ্যাজ মাই লফুল ওয়াইফ। নন্দিতা বললো, আমি নন্দিতা ব্যানার্জী, সুবীর মুখার্জীকে আইনসঙ্গত স্বামী হিসেবে গ্রহণ করলাম।

তারপর মালাবদল হলো ও সুবীর নন্দিতার সিঁথিতে সিঁতুর

দিল। হঠাৎ একজন শাঁখ বাজিয়ে সমস্ত পরিবেশটাকে আরো আনন্দময় করে তুললো।

সাবিত্রী এসব বিয়ের সময় বাইরের ঘরে আসেন না, তবে ওদের সবার অনুরোধে আজ শুধু উপস্থিতই ছিলেন না, বরণডালা দিয়ে বরণ করে আশীর্বাদও করলেন। সুবীর আর নন্দিতা মিঃ সোম আর সাবিত্রীকে প্রণাম করল।

এর ঠিক দিনতিনেক পরের কথা। মিঃ সোমের ছাত্রজীবনের বন্ধু দীপেন চ্যাটার্জী এসে হাজির।

মিঃ সোম খুশির হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার তোমার? তিন-চারখানা চিঠি দিয়েও···

দীপেনবাবু বললেন, তোমার সব চিঠিই পেয়েছি! কিন্তু জবাব দেবার মতো অবস্থা ছিল না।

কেন? কী হলো?

তোমার কপালে চিরযৌবনা স্ত্রী জুটলেও আমার কপালে ··

মিঃ সোম হাসতে হাসতে বললেন, পরে আমার স্ত্রীর প্রশংসা করো। আগে বল বৌদির কী হয়েছিল?

আরে ভাই বলো না, হঠাৎ ওর চোখের দৃষ্টি কমতে শুরু করল।

তারপর?

তারপর হঠাৎ চোখ দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করল।

বল কী?

হ্যাঁ ভাই। সে যে কী ঝামেলার মধ্যে কটা মাস কাটিয়েছি—

এখন কেমন আছেন?

শেষ পর্যন্ত পিনাকী রায়কে দেখিয়ে চশমা নেবার পর থেকে ভালই আছে।

আমার এক মাসতুতো ভাই তো প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাকেও পিনাকী রায় ভাল করে দিয়েছেন।

নর্থ বেঙ্গলে তো দূরের কথা, সারা বাংলাদেশে অমন চোখের ডাক্তার আছেন কিনা সন্দেহ।

সাবিত্রী বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দীপেনবাবুকে দেখেই হাসতে হাসতে বললেন, এত দিন পরে আমাদের মনে পড়ল?

দীপেনবাবু তাঁর স্ত্রীর অসুস্থতার কথা বলার পর বললেন, ছ-মাসের চেষ্টায় আজ কলকাতা এলাম।

এই এক বছরের মধ্যে আর কলকাতা আসেননি?

না বৌদি। কলকাতায় এসে তো আপনাদের এখানে ছাড়া আর কোথাও উঠি না।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর দুই বন্ধুতে বাইরের ঘরে বসে গল্প করছিলেন।

মিঃ সোম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মামলামোকদ্দমার কাজে এসেছ?

না ভাই, এবার কোন মামলামোকদ্দমার কাজে আসি নি। এবার আমার এক ভগ্নীপতির কাজে এসেছি।

কী কাজ?

হালিশহরে আমার ভগ্নীপতির কিছু সম্পত্তি আছে। সেটা বিক্রির ব্যাপারে কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে এসেছি।

হঠাৎ হালিশহরের সম্পত্তি বিক্রি করছেন কেন?

আমার এই ভগ্নীপতি এককালে খুবই বড়লোক ছিল কিন্তু এখন বড়ই বিপদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। হালিশহরের সম্পত্তি বিক্রি না করে ওর পক্ষে মেয়ের বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, অথচ—

অথচ কী?

এই হালিশহরের বাড়িভাড়া থেকে ওর তিন মেয়ের পড়াশুনার খরচা চলছে।

তাহলে কেন বিক্রি করছেন?

ওদের এমনই ফ্যামিলির ধারা যে মেয়ের বিয়ে দিতে অন্ততপক্ষে হাজার চল্লিশেক টাকা দরকার।

চল্লিশ হাজার?

হ্যাঁ ভাই। এর কমে ঐ ফ্যামিলির মেয়ের বিয়ে হয় না।

হালিশহরের বাড়ি বিক্রি করে কত টাকা হবে?

বড় জোর পঞ্চাশ। দীপেনবাবু একটু থেমে বললেন, আমার দিদির তিনটি মেয়েই লেখাপড়ায় অত্যন্ত ভাল। বড় মেয়েটি কলকাতায় এম. এ. পড়ছে, আর ছুটি মেয়ে গৌহাটিতে পড়ছে। হালিশহরের বাড়ি বিক্রি হবার পর হয়ত ছোট মেয়ে ছুটোর পড়াশুনোই বন্ধ হয়ে যাবে।

মিঃ সোম একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে কত পরিবার যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তার ঠিকঠিকানা নেই।

হালিশহরের বাড়ি বিক্রি করে আমার এই বড় ভাগ্নীর বিয়ে হলে এই ফ্যামিলিটাও ধ্বংস হয়ে যাবে।

তবু ফ্যামিলি ট্রাডিশন রাখতে হবে?

হ্যাঁ ভাই। তা না রেখে বুঝি ওদের উপায় নেই।

একটু পরে মিঃ সোম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বড় ভাগ্নীর বিয়ে কি ঠিক হয়ে গেছে?

না, ঠিক হয়নি, তবে সে ব্যাপারেও আমাকে একটা ছেলে দেখতে হবে।

ছেলে কি কলকাতায় থাকে?

হ্যাঁ, বেহালায় ওদের নিজেদের বাড়ি আছে।—

ছেলেটি কি করে?

একটা বড় প্রাইভেট কনসার্নে অ্যাসিসট্যাণ্ট একাউণ্ট্যাণ্ট। তবে নগদ চায় দশ হাজার।

দশ হাজার?

হ্যাঁ ভাই। যদি হাজার পাঁচেকে রাজী করাতে পারি, তাহলে বোধহয় এখানেই ভাগ্নীর বিয়ে ঠিক করে ফিরব।

কিন্তু এই ছেলের জন্য দশ হাজার ?

ওঁরা বলছেন, গৌহাটিতে গিয়ে বিয়ে দিতে হলে অনেক খরচ—

ওঁদের মেয়ে পছন্দ হয়েছে ?

দীপেনবাবু তাড়াতাড়ি স্যুটকেশ থেকে একটা ফটো বের করে বললেন, তুমিই বলো, এ মেয়েকে কেউ অপছন্দ করবে ?

ফটোটা দেখেই মিঃ সোম চমকে উঠলেন। কোন মতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, এইসব শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়েরা যদি আমাদের মত ম্যারেজ অফিসারের কাছে এসে বিয়ে করে—

তাহলে তো ফ্যামিলিটা রক্ষা পেতো, কিন্তু নন্দিতা সে ধরনের মেয়ে নয়।

মিনিটখানেক চুপ করে থাকার পর মিঃ সোম বললেন, একটা কথা বলব তোমাকে ?

নিশ্চয়ই বলবে।

তুমি তোমার ভগ্নীপতির হালিশহরের সম্পত্তি বিক্রি করো না, বেহালাতেও যেতে হবে না।

কেন ?

আমি কথা দিচ্ছি, এ মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা আমি করে দেব।

কিন্তু—

আমার উপর একটু বিশ্বাস রাখো। এ মেয়েকে সৎ পাত্রের হাতে দেবার দায়িত্ব আমার।

কিন্তু যদি তুমি ফেল করো—

মিঃ সোম একটু হেসে বললেন, চিন্তা করো না। এত বড় কলকাতা শহরে একটা ভদ্র শিক্ষিত ছেলে ঠিকই খুঁজে বের করব। একটু থেমে উনি বেশ জোরের সঙ্গে বলেন, এবং তুমি জেনে রাখো এমন ছেলের সঙ্গে তোমার ভাগ্নীর বিয়ে দেব, যে তোমার ভগ্নীপতির হাজার টাকাও খরচ করাবে না।

তুমি যদি তা পারো তাহলে সত্যি বড় উপকার হবে।

এর মধ্যে কোন যদি নেই, এ কাজ আমি করবই। মিঃ সোম একটু থেমে বললেন, তোমার ভগ্নীপতি ও ভাগ্নীর সব ডিটেলস আমাকে লিখে দিয়ে যাবে। আর তোমার ভাগ্নীকে আমার বিষয়ে কিছু বলো না, শুধু বলে যেও তোমার এক বন্ধু যোগাযোগ করতে পারে।

তোমার নামও বলব না?

না। হাজার হোক বিয়ের ব্যাপারে আগের থেকে কাউকেই সব কিছু না জানানোই ভাল।

তা ঠিক।

কলকাতার অন্যান্য কাজকর্ম সেরে দিন দুই পরে দীপেনবাবু কুচবিহার ফিরে গেলেন। তার পরের দিনই মিঃ সোম ম্যারেজ নোটিশ বুক থেকে সুবীরের ঠিকানা দেখে চিঠি দিলেন—তোমাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে। একদিন সময় করে এসো। খুব খুশী হবো।

তিন-চারদিন পরেই সুবীরের জবাব এলো—আপনার চিঠি পেয়ে খুব ভাল লাগল। ইতিমধ্যে আপনাদের সঙ্গে দেখা করা উচিত ছিল, কিন্তু ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম বলে যোগাযোগ করতে পারি নি। সেজন্য ক্ষমা করবেন। যাই হোক, রবিবার দুপুরে দুজনেই আসছি। মাসীমাকে বলবেন, দুপুরে দুজন খাবে।

রোজ ঠিকে ঝি মানদাই বাজার করে দেয়, কিন্তু রবিবার সকালে উঠেই মিঃ সোম নিজে বাজার গেলেন। শাকসবজি মাছ ভর্তি থলে রান্নাঘরের সামনে রেখে সাবিত্রীকে বললেন, হ্যাঁগো, আলুবখরা এনেছি।

খুব ভাল করেছ। তুমি বেরিয়ে যাবার পরই আমার মনে পড়ল।

খানিকটা পরে দুটি ছেলেমেয়ে এসে বিয়ের নোটিশ দিয়ে গেল। ওরা চলে যাবার দশ-পনের মিনিট পরেই সুবীর আর নন্দিতা এসে হাজির।...

বহুদিন পরে ছেলে আর পুত্রবধূ এলে যেমন আনন্দ হয়, ঠিক সেই রকম আনন্দে ঝলমল করে উঠলেন মিঃ সোম আর সাবিত্রী।

বাইরের ঘরের চেয়রে-টেবিলে না, ভিতরের ঘরে বিছানার উপর বসেই চা খেতে খেতে চারজনে মিলে বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা দিলেন। তারপর সাবিত্রী বললেন, তোমরা বাইরের ঘরে গিয়ে গল্প করো। আমি আর নন্দিতা রান্না সেরে নিই।

বাইরের ঘরে এসে ওঁরা দুজনে পাশাপাশি বসলেন। মিঃ সোম বললেন, একটু জরুরী কথাবার্তা বলার জন্যই তোমাকে ডেকে এনেছি।

সুবীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে ওর দিকে তাকাতেই উনি হেসে বললেন, না, না, চিন্তার কিছু নেই।

এবার সুবীর নিশ্চিন্ত হয়ে একটু হাসে।

মিঃ সোম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের বিয়েটা কিভাবে হলো?

সুবীর বলে, এককালে আসামের তিন-চারটে চায়ের বাগানের মালিক ছিলেন নন্দিতার বাবা-কাকারা। তারপর পারিবারিক শত্রুতার জন্য একে একে সব বাগান মারোয়াড়ীদের কাছে বিক্রি হয়ে গেল। এখন ওর বাবার অবস্থা সত্যি খুব খারাপ। সুবীর একটু হেসে বললো, আমাদের দেশে বা সমাজে অর্থ না থাকলেও ঐতিহ্য থাকে। এখন পারিবারিক মর্যাদা মত নন্দিতার বিয়ে দিতে হলে ওর বাবাকে সর্বস্ব খোয়াতে হতো।

তোমাদের এবিষয়ে সম্বন্ধ করলো কে?

ইন্দিরা গাঙ্গুলী। সুবীর একটু হেসে বললো, আমার ছোড়দির নাম ইন্দিরা। তাই ও আমার সঙ্গে পড়লেও ওকে আমি ছোড়দি বলি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। ছোড়দি আর নন্দিতা হস্টেলের একই ঘরে থাকে।

তোমার বাবা কী করেন?

আমার বাবা মারা গিয়েছেন।......

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

বাড়ীতে আর কে কে আছেন?

দিদি ও ছোড়দির বিয়ে হয়ে গেছে। এখন বাড়ীতে আমি আর মা আছি।

তোমাদের সংসার কে চালান ?

আমাদের বাড়ীটা নিজেদের। একতলার দুটি ফ্যামিলি ছাড়াও চারটি দোকানঘর আছে···

তাহলে তো ভাড়ার টাকাতেই সংসার চলে যায়।

আপনাদের আশীর্বাদে ভালভাবেই চলে যায়। এই বাড়ীভাড়া ছাড়াও বড় বড় কোম্পানির কিছু শেয়ার আছে।

তোমার বিয়ের কথা মা জানেন ?

না, তবে মা জানেন, নন্দিতাকে বিয়ে করব।

মার মত আছে ?

সুবীর হসে বললো, নন্দিতাকে মার খুব পছন্দ।

নন্দিতার বাবা-মাও নিশ্চয়ই বিয়ের কথা জানেন না ?

না। আমার পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার পর সবাইকে জানান হবে। সুবীর মুখ নীচু করে বললো, আমাদের বিয়ে হলেও আমরা আগের মতই আছি।

মিঃ সোম সুবীরের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, তুমি যে খাঁটি সোনা তা তোমাকে প্রথম দিন দেখেই বুঝেছিলাম। একটু থেমে বললেন, তাহলে তোমার রেজাল্ট বেরুবার পর আনুষ্ঠানিক ভাবেই বিয়ে করো।

হ্যাঁ তাই করব।

সাবিত্রী আর নন্দিতা বাইরের ঘরে আসতেই মিঃ সোম বললেন, বসো। তারপর হাসতে হাসতে নন্দিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, বেহালার একটি ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করার জন্য দীপেন কলকাতায় এসেছিল।······

নন্দিতা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ছোটমামার আসার খবর আপনি জানলেন কী করে ?

সাবিত্রী হাসতে হাসতে বললেন, দীপেন ঠাকুরপো ওর ক্লাশ-ফ্রেণ্ড। উনি কলকাতায় এলে সব সময় আমাদের এখানেই থাকেন।

নন্দিতা প্রায় চিৎকার করে উঠল, তাই নাকি?

মিঃ সোম জিজ্ঞাসা করলেন, দীপেন কী কী কাজে কলকাতা এসেছিল জানো?

নন্দিতা মাথা নেড়ে বললো, না।

তোমার বিয়ের জন্য তোমাদের হালিশহরের বাড়ী বিক্রি করতে আর বেহালার ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে পাকা করতে।

এতক্ষণ শোনার পর সুবীর জিজ্ঞাসা করল, উনি যে নন্দিতার মামা তা জানলেন কেমন করে?

দীপেনের কাছে নন্দিতার ফটো দেখেই·········

নন্দিতা বললো, ছবিটা না দেখলেই কেলেঙ্কারি হতো।

সাবিত্রী হাসতে হাসতে বললেন, দীপেন ঠাকুরপোকে উনি কথা দিয়েছেন তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করবেন।

সুবীর একটু হেসে নন্দিতাকে বললো, ভগবান আমাদের ঠিক জায়গাতেই পেঁৗছে দিয়েছেন।

প্রবীরবাবু আর সুমিত্রা ভি. আই. পি. রোডে থাকলেও মাঝে মাঝে আসেন। না এসে পারেন না।

সুমিত্রার হাতে মিষ্টির প্যাকেট দেখেই মিঃ সোম বলেন, দিদি, রোজ রোজ মিষ্টি নিয়ে আসা কী ঠিক হচ্ছে?

সুমিত্রা একটু কপট গাম্ভীর্য এনে বলেন, একশ-বার ঠিক হচ্ছে। মিষ্টি আনি বলে কি আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারবেন?

না দিদি, সে সাহস নেই।

সাবিত্রী বলেন, জানো সুমিত্রা, তোমার দাদা এখন সব নেমন্তন্ন-বাড়ীতেই তোমার ভাইফোঁটায় দেওয়া ধুতি-পাঞ্জাবি পরে যাবেন আর সবাইকে বলবেন·········

সুমিত্রা কপালে হাত দিয়ে বলেন, হা ভগবান ! ঐ ধুতি-পাঞ্জাবির কথা আবার সবাইকে বলেন ?

মিঃ সোম বলেন, তুমি যেমন একশবার মিষ্টি আনবে, আমিও সেইরকম ধুতি-পাঞ্জাবির কথা একশবার সবাইকে বলব ।

সুমিত্রা বললো, ঠিক আছে। সামনের বার আণ্ডারওয়ার-গেঞ্জি দেব । দেখি, কি করে বলে বেড়ান ।

তুমি দিতে পারলে আমিও বলতে পারব ।

দেখতে দেখতে মিঃ সোমের এখানে কয়েক শ' ছেলেমেয়ের বিয়ে হলো ; কিন্তু এ ধরনের মধুর সম্পর্ক ছু-চারজনের সঙ্গেই গড়ে উঠেছে ।

বিয়ের পর সুমিত্রা চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। সাবিত্রীকে বলে, যখন নিঃসঙ্গ ছিলাম তখন বাধ্য হয়ে চাকরি করেছি। কিন্তু এখন আর টাকার লোভে চাকরি করতে ইচ্ছে করে না ।

সাবিত্রী সঙ্গে সঙ্গে তাকে সমর্থন জানান, ঠিক করেছ ।

সুমিত্রা বলে, এর আগে আমার বিয়ে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সংসার করি নি ।

সাবিত্রী ওর কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারেন না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুমিত্রার দিকে তাকাতেই ও বলে, যে মহাপুরুষের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল, সে একদিনের জন্যও আমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয় নি। তাছাড়া এত বেশী নেশা করতো যে, যখন ঘরে আসতো তখন তার কোন জ্ঞানই থাকত না ।

সাবিত্রী বললেন, মাঝখান থেকে শুধু শুধু তোমার জীবনটা ওলট-পালট হয়ে গেল ।

তাছাড়া বাবার সারা জীবনের সঞ্চয় নষ্ট হলো। সুমিত্রা এবার একটু হেসে বললো, যাই বলো বৌদি । এখন আর আমার কোন দুঃখ নেই। প্রবীরকে পেয়ে আমার জীবন ধন্য হয়েছে ।

সত্যি ঠাকুরপোর মত ছেলে হয় না ।

আমি জানতাম, প্রবীর ভাল কিন্তু সতের বছর পর ওকে আবার নতুন করে পেয়ে বুঝলাম, ও অসাধারণ।

তা না হলে কেউ সতের বছর ধরে এইভাবে জীবন কাটাতে পারে ?

সুমিত্রা একটু আনমনা হয়। উদাস দৃষ্টি দূরের, বহুদূরের আকাশের কোলে ঘোরাঘুরি করে। সাবিত্রী ওর দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারে, সুমিত্রা কাছে বসেও দূরে চলে গেছে। ফেলে আসা দিনের স্মৃতি রোমন্থন করছে। কখনও খুশির হাসিতে মুখখানা উজ্জ্বল ভাস্বর হয়ে উঠছে; কখনও আবার ব্যথা-বেদনায় ম্লান হচ্ছে ঐ উজ্জ্বল সুন্দর মুখখানা।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল, কী ভাবছ ?

ভাবছি তোমার ঠাকুরপোর কথা। তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে বিয়ের পর তোমার ঠাকুরপোর ঘর করতে গিয়ে কী দেখলাম জানো ?

কী ?

দেখলাম, আলমারির মধ্যে সতেরটা শাড়ী রয়েছে।···

আচ্ছা।

ঐ শাড়ীগুলো কিসের জানো ?

কিসের ?

আগে ও আমার জন্মদিনে প্রতি বছর একটা শাড়ী দিতো। যে সতের বছর আমাকে কাছে পায় নি, সেই সতের বছরেও আমার জন্মদিনে ও প্রতি বছর শাড়ী কিনেছে।

কী আশ্চর্য !

সুমিত্রা একটু হেসে বললো, আগে আগে আমরা দুজনে খুব থিয়েটার দেখতাম। তোমার ঠাকুরপো আমাকে কাছে পায় নি বলে একলা একলা একটাও থিয়েটার দেখে নি।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ বৌদি। এই লোকটা আমার জন্য যে কী আত্মত্যাগ করেছে তা ভাবলেও অবাক লাগে।

এই আত্মত্যাগ করেছে বলেই তো ঠাকুরপো তোমাকে হারিয়েও আবার পেয়েছে।

আবার একটু চুপচাপ। আবার সুমিত্রা কোথায় যেন হারিয়ে যায়।··

জানো বৌদি, মাঝে মাঝে হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখি, তোমার ঠাকুরপো বসে আছে।

কী হলো? বসে আছো কেন?

প্রবীর একটু হেসে বললো, ঘুম আসছে না।

কেন? শরীর খারাপ লাগছে?

না, না, শরীর খারাপ লাগছে না।

তবে?

তোমাকে দেখছি।

সুমিত্রা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, তার মানে?

প্রবীর সুমিত্রার মুখের সামনে মুখ নিয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে একবার ওকে দেখে। তারপর বলে, হ্যাঁ মিত্রা, তোমাকে দেখতে এত ভাল লাগে যে কিছুতেই ঘুম আসে না।

তাই বলে রাত জেগে আমাকে দেখবে?

হ্যাঁ।

দেখে দেখে আশা মেটে না?

না।

কেন?

দিনে আমরা সবাই দায়িত্ব-কর্তব্যের দাস। তাই তখন আমাদের আসল রূপটা দেখা যায় না। রাত্তিরেই মানুষের সৌন্দর্য···

সুমিত্রা হাসতে হাসতে বলে, তাই বলে এত রাত্রে আর আমার

মত বুড়ীর সৌন্দর্য দেখতে হবে না। তাছাড়া এভাবে ক'. রাত্তির আমার সৌন্দর্য দেখলে তোমাকে আর সুস্থ থাকতে হচ্ছে না।

প্রবীর বলে, অসুস্থ হলে তো তোমাকে সব সময় কাছে পাবো।

সব শোনার পর সাবিত্রী বললেন, সত্যি ঠাকুরপো একটা আস্ত পাগল।

সুমিত্রা একটু আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে বললো, তোমার ঠাকুরপো সত্যিই পাগল! একটু থেমে, একটু এদিক-ওদিক দেখে, একটু চাপা গলায় বললো, সারা রাত ঠিক বাচ্চা ছেলের মত আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকবে। সকালবেলায় ঘুম ভাঙ্গার পর ওকে ঐভাবে শুয়ে থাকতে দেখে ভীষণ মায়া হয়।

সাবিত্রী বলেন, ঠাকুরপো সম্পর্কে তোমার দাদাও ঠিক ঐ কথাই বলেন।

দাদা কি বলেন?

বলেন, প্রবীরের চোখ দুটো দেখলেই ভীষণ মায়া হয়। ··

আর কি বলেন?

বলেন, প্রবীরের বয়স হয়েছে, কিন্তু তবু ওকে ছোট ছেলের মত আদর করতে ইচ্ছে করে।

দাদাকে ও দারুণ শ্রদ্ধা করে।

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অফিসের কাজের জন্য প্রবীরবাবু বেশী দিন আসতে না পারলে সুমিত্রা একলাই চলে আসে। বিকেলের দিকে অফিসছুটির পর প্রবীরবাবু এখান থেকে সুমিত্রাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যান।

সুমিত্রা এলে সারা দুপুর সাবিত্রীর সঙ্গে গল্প হবেই।

জানো বৌদি, যে মেয়েরা কোনদিন কাউকে ভালবাসেনি বা কারুর ভালবাসা পায়নি তারা যে কোন পুরুষের কাছে নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে। কিন্তু আমার মত মেয়েরা তা পারে না।

সাবিত্রী বলেন, প্রবীরবাবু সত্যি অপূর্ব মানুষ।

আমি তো ভগবানের চাইতেও ওকে বেশী ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি।

নিশ্চয়ই করবে।

সুমিত্রা একটু হেসে বলে, আমি ওকে কি বলি জানো?

কি?

বলি, রামচন্দ্র চোদ্দ বছর বনবাসে গিয়েছিলেন বলেই যদি রামায়ণ লেখা যায়, তাহলে তুমি আমার জন্য কুড়ি বছর অপেক্ষা করেছ বলে রামায়ণের চাইতে বড় কিছু লেখা যায়।

সাবিত্রী একটু হেসে জিজ্ঞাসা করেন, প্রবীরবাবু কী বলেন?

সুমিত্রাও হাসে। বলে, ও বলে, সে মহারামায়ণ আমাকেই লিখতে হবে, আমাকেই পড়তে হবে।

এবার সাবিত্রী একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, তোমার মত মেয়েকে ভালবেসেছিলেন বলেই উনি কুড়ি বছর অপেক্ষা করেছিলেন।

তার মানে?

এই বয়সেও তোমার রূপ দেখে অনেক পুরুষেরই মাথা ঘুরে যাবে।

সুমিত্রা একটু লজ্জিত বোধ করে। বলে, তা তো বটেই।

সাবিত্রী ওর গাল টিপে বলেন, এমন সর্বনাশা রূপসীর প্রেমে পড়লে কি কোন পুরুষের বাঁচার উপায় থাকে?

সুমিত্রা এলে সাবিত্রীর আর কাজে মন লাগে না। কোন মতে কাজকর্ম করেই গল্প করবে। সুমিত্রার সঙ্গে গল্প করতে ওর এতই ভাল লাগে যে রমেনবাবু একটু বেশী বাজার করলেই উনি বলেন, আচ্ছা, তুমি কী ভেবেছ বল তো?

রমেনবাবু অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, আমি আবার কী করলাম?

আমাকে না বলেই এত মাছ আনলে কেন?

এবার রমেনবাবু হেসে বলেন, রোজ রোজ তো এসব মাছ পাওয়া যায় না। তাছাড়া দিদি এসেছে···

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সাবিত্রী স্বগতোক্তি করেন, কোথায় একটু গল্পগুজব করব। তা না! এখন আমাকে সারাদিন এই রান্নাঘরের মধ্যে বন্দিনী হয়ে থাকতে হবে।

রমেনবাবু তখনও হাসেন। বলেন, তুমি একলা একলা রাঁধবে কেন? দিদিও নিশ্চয়ই কিছু রাঁধবে।

তোমার দিদি যদি রান্নাঘরে থাকে, তাহলে কী আমি চেয়ার-টেবিলের সঙ্গে গল্প করব?

দিদি যখন রান্নাঘরে কাজ করবে, তখন তুমি আমার সঙ্গে গল্প করবে।

সুমিত্রা বাথরুম থেকে স্নান করে বেরিয়েই বলে, হ্যাঁ বৌদি, তুমি দাদার সঙ্গে গল্প করো। আমি রান্না করে দেব।

সাবিত্রী হেসে বলে, তোমার দাদার ন্যাকামির কথা বাদ দাও। মাঝে মাঝে তোমার দাদা এমন ঢং দেখায় যে······

সাবিত্রীর কথা শুনে সুমিত্রা হাসে। রমেনবাবু সুমিত্রার সামনে এইসব কথা শুনে অস্বস্তি বোধ করেন, লজ্জিত হন। তাই বলেন, বলছিলাম, অনেক দিন তো দিদির হাতের রান্না খাই না, তাই···

সুমিত্রা বলে, তুমি যাই বলো বৌদি, আজ আমি তোমাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দিচ্ছি না।

সুমিত্রা-প্রবীরবাবুর বিয়ের পর শুধু ওদের জীবনেই নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় নি; ওদের বিয়ের পর ম্যারেজ রেজিস্ট্রার রমেন সোম ও তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীর জীবনেও আনন্দের জোয়ার এসেছে।

এখন রমেন সোমের বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে। জীবনে অনেক অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পরই উনি ম্যারেজ অফিসার হন, কিন্তু এই নতুন ভূমিকায় স্বল্পকালীন সময়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তা বহু মানুষ সারা জীবনেও সঞ্চয় করতে পারে না।

এক দল ছেলেকে সঙ্গে এনে যেদিন দিলীপ আর মায়া বিয়ের নোটিশ দিতে এসেছিল, সেদিনই ওর একটু খটকা লেগেছিল। তবে আইন অনুসারে যে কোন আঠারো বছরের মেয়ে আর একুশ বছরের ছেলে নিজেদের পছন্দমত বিয়ে করতে পারে বলে উনি কিছু বলেননি। নোটিশ দেবার ঠিক এক মাস পরে যেদিন ওরা বিয়ে করল, সেদিনও মিঃ সোম কোন আগ্রহ দেখান নি। আইনমত কর্তব্য সম্পাদন করে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, আমি শ্রীরমেন্দ্রনাথ সোম এতদ্দারা নিশ্চিতভাবে জানাইতেছি যে ·····শ্রীদিলীপ ঘোষ ও শ্রীমতী মায়া ঘোষ (বসু) আমার সামনে হাজির হন এবং নীচে স্বাক্ষরিত তিনজন সাক্ষী সমক্ষে ১১নং ধারা অনুযায়ী ঘোষণা করিবার পর আইনানুসারে আমার সামনে উহাদের বিবাহ সম্পাদিত হয়।

এই বিয়ে হবার কয়েক দিন পরে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে হাজির।

আমার নাম নিবারণ ঘোষ। একটু বিপদে পড়েই আপনার কাছে এসেছি।

মিঃ সোম বললেন, বলুন, আমি কি করতে পারি।

আপনি রেজিস্ট্রি বিয়ে দেন ?

মিঃ সোম শুধু মাথা নাড়লেন।

ইদানীংকালে শিবনাথ ঘোষ নামে কোন ছেলের বিয়ে দিয়েছেন ?

মিঃ সোম রেজিস্ট্রার দেখে বললেন, না, ঐ নামের কোন ছেলের বিয়ে আমি দিইনি।

নিবারণবাবু বেশ মুষড়ে পড়লেন। বললেন, দেননি ? কিন্তু পাড়ায় রটেছে······

কী রটেছে ?

আপনার এখানেই রমার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে।

মিঃ সোম আবার ভাল করে রেজিস্ট্রার দেখে বললেন, রমা নামের কোন মেয়ের বিয়েও তো আমার এখানে হয়নি।

নিবারণবাবু মাথা নীচু করে কি যেন ভাবেন।

মিঃ সোম জিজ্ঞাসা করলেন, কতদিন আগে ওদের বিয়ে হয়েছে বলতে পারেন ?

কবে বিয়ে হয়েছে তা তো বলতে পারব না, তবে কবে পালিয়েছে তা বলতে পারি।

কবে পালিয়েছে ?

গত রবিবার ভোরে।

মিঃ সোম রেজিস্ট্রার খুলে বললেন, গত শুক্রবার ৭ই মে আমার এখানে দিলীপ ঘোষের সঙ্গে মায়া বসুর বিয়ে হয়েছে।······

দিলীপ ঘোষ ? মেয়েটির নাম কী বললেন ?

মায়া বসু।

না, না, ও না।

শিবনাথ কাকে নিয়ে পালিয়েছে ?

সম্পর্কে আমার এক জ্ঞাতি বোন রমা মিত্তিরকে নিয়ে পালিয়েছে। নিবারণবাবু একটু থেমে বললেন, সব চাইতে বড় কথা সামনের জ্যৈষ্ঠে রমার বিয়ের ঠিক হয়েছে।

হঠাৎ রেজিস্ট্রারের দিকে দৃষ্টি পড়তেই মিঃ সোম বললেন, আচ্ছা সাক্ষীদের নাম বলছি। দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা। জ্যোতি চক্রবর্তী, নন্দদুলাল দে আর কমল রায়।

নিবারণবাবু ঠোঁট উল্টে বললেন, না, ওদের কাউকেই চিনতে পারলাম না।

এবার মিঃ সোম জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি শিবনাথ আর রমার হাতের লেখা চিনতে পারবেন ?

শিবনাথের হাতের লেখা চিনতে পারব, কিন্তু রমার হাতের লেখা তো চিনতে পারব না।

মিঃ সোম বিয়ের নোটিশ দেবার ফর্মের বাণ্ডিলটা বের করে

দিলীপ ঘোষের এ্যাপ্লিকেশনটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা।

নিবারণবাবু পকেট থেকে চশমা বের করে চোখে দিয়ে একটু ঝুঁকে পড়েই প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ত শিবুর হাতের লেখা।

এবার মিঃ সোম হেসে বললেন, তাহলে আপনার ছেলে সবকিছু মিথ্যা বলে ঐ রমাকেই বিয়ে করেছে।

তাহলে উপায় ?

পুলিশে রিপোর্ট করুন। বিচারে ওদের দুজনেরই জেল হবে।

কিন্তু .....

কিন্তু কী ?

তাতে তো আমি বাঁচতে পারব না। ঐ মেয়েটার বাবা-মাকে আমি কি বলব ? নিবারণবাবু খুব জোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আপন মনেই বললেন, অত গহনাগাটি কোথা থেকে আমি পাবো ?

মিঃ সোম জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা কী অনেক গহনা-টহনা নিয়ে গেছে।

আর বলবেন না। হারামজাদা আমাকে পথে বসিয়ে দিয়েছে। এবার মুখ তুলে মিঃ সোমের দিকে তাকিয়ে বললেন, রমার মার পঁচিশ-তিরিশ ভরি গহনা আমার স্ত্রীর কাছে ছিল। তার একটাও ওরা রেখে যায়নি।

আপনি কি পুলিশে রিপোর্ট করতে চান না ?

পুলিশে রিপোর্ট করে আর কি হবে ? যে কেলেঙ্কারি, যে সর্বনাশ হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন উপরে থুথু ফেললে তো নিজের গায়ে এসেই পড়বে।

তা ঠিক।

নিবারণবাবুকে দেখলেই মনে হয়, অত্যন্ত সৎ ও সহজ সরল মানুষ। গলায় তুলসীর মালা প্রমাণ করছে, ভদ্রলোক বৈষ্ণব।

ধার্মিক। চোখমুখের চেহারা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, ছেলের কাণ্ড-কারখানায় উনি হতবাক হয়ে গেছেন। মিঃ সোম ওকে যত দেখেন, তত বিষণ্ণ হন মনে মনে। কিন্তু ওকে সাহায্য করতে না পেরে আরো বেশী বিষণ্ণ, আরো বেশী অসহায় বোধ করেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর নিবারণবাবু কোন কথা না বলে চোরের মত মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আইন বড় নির্দয়। আইনের নির্দেশমত কর্তব্য পালন করতে গিয়ে মনের মধ্যে আরো অনেকবার কালবৈশাখীর মাতলামি হয়েছে, কিন্তু কিছু করতে পারেননি। মুখ বুজে কর্তব্য পালন করেছেন।

বেল বাজতেই মিঃ সোম দরজা খুলে দেখলেন, বাইশ-তেইশ বছরের একটি অত্যন্ত আধুনিকা মেয়ে আর তার পিছনে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছরেব একটি লোক। ভদ্রলোক বলতে যা মনে হয়, লোকটি তা নয়। মেয়েটির পরনে একটা জিন্স, উপরে একটা নটেড ব্লাউজ। তাও উপরের দিকের গোটা তুই বোতাম খোলা।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, একস্‌কিউজ মী, আপনিই কি ম্যারেজ অফিসার মিঃ সোম?

প্রশ্নটি শুনেই উনি বুঝলেন, মেয়েটি আইন জানে। সাধারণ সবাই বলে, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার কিন্তু আইন বলে ম্যারেজ অফিসার। উনি বললেন, হ্যাঁ।

বিয়ের নোটিশ দিতে এসেছি। আপনার কী এখন সময় হবে?

নিশ্চয়ই। ভিতরে আসুন।

মিঃ সোম কথাটা শেষ করতে না করতেই মেয়েটি পিছন ফিরে বললো, জন, কাম ইন।

তিনজনে ঘরে এসে বসতেই মেয়েটি ইংরেজীতে বললো, আমি মিস প্রীতি মজুমদার। আই ইনটেণ্ড টু ম্যারি জন।

মিঃ সোম জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নিশ্চয়ই আঠারো বছর পূর্ণ হয়েছে ?

মিস মজুমদার সঙ্গে সঙ্গে কাঁধে ঝোলান ব্যাগ থেকে পাসপোর্ট বের করে মিঃ সোমের সামনে খুলে ধরে বললো, আমার তেইশ বছর বয়স হলো। একটু পাশ ফিরে জনের দিকে তাকিয়ে বললো, জনের বয়স থার্টি-ফাইভ।

মিঃ জন বিবাহিত কি ?

ওরা দুজনে একসঙ্গে উত্তর দিল, না।

মিঃ সোম ফর্ম দেবার দু-তিন মিনিটের মধ্যেই মিস মজুমদার সব কিছু লিখে জনকে বললো, জন, প্লীজ সাইন হিয়ার।

জন কোন কথা না বলে সই করল।

এবার মিস মজুমদার ব্যাগ থেকে একটা খাম বের করে টেবিলে রেখে বললো, আপনার ফী।

ওরা আর দেরী করল না। উঠে দাঁড়াল। দুজনেই বিদায় নেবার আগে বললো, গুড বাই !

গুড বাই !

ওরা চলে গেলেও ওদের পথের দিকে চেয়ে মিঃ সোম বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলেন।

ঠিক এক মাস পরে শিক্ষিতা, সুন্দরী ও আধুনিকা মিস প্রীতি মজুমদারের সঙ্গে খানসামা মিঃ জন নিকোলাস ডায়াসের বিয়ে হলো।

বিয়ের জন্য মিস মজুমদার একটা সুন্দর ম্যাকসি-স্কার্ট পরেছিল ; জন পুরোদস্তুর সাহেব সেজেছিল। যারা সাক্ষী দিল তারা সবাই জনের বন্ধু। বিয়ের শেষে প্রীতিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে জন চুমুও খেল।

মিঃ সোম ভেবেছিলেন, এখানেই নাটক শেষ হলো, কিন্তু না, নাটকের তৃতীয় অঙ্ক অভিনীত হলো মাস ছয়েক পরে।

সকালবেলায় কাগজ পড়ার সময় ঠিক নজরে পড়ে নি। দুপুর-

বেলায় ভাল করে কাগজ পড়তে গিয়েই মিঃ সোম চমকে উঠলেন।······

ঘটনাস্থল—দিল্লী।

দৃশ্য— বিশিষ্ট অভিজাত পল্লী।

সময়—গভীর রাত্রি।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক মার্কিন সংস্থার উত্তর ভারতের ম্যানেজার সস্ত্রীক ককলেট আর ডিনার সেরে যখন ফিরলেন, তখন রাত প্রায় একটা। এ ধরনের নেমন্তন্ন থেকে উনি এইরকম সময়েই ফেরেন এবং গাড়ীর হর্ন বাজাবার সঙ্গে সঙ্গেই ওদের বারো বছরের পুরানো খানসামা জন নিকোলাস ডায়াস ছুটে এসে দরজা খুলে দেয়।

ম্যানেজার সাহেব আরো দু-তিনবার হর্ন বাজালেন, কিন্তু না, খানসামা এলো না। অত রাত্রে বেশী জোরে বারবার হর্ন বাজালে প্রতিবেশীদের বিরক্ত করা হবে মনে করে ম্যানেজার সাহেব গেট টপকে লনে ঢুকে বাড়ীর পিছনদিকে গেলেন।

একটু এদিক-ওদিক উঁকি মেরেও খানসামাকে দেখতে পেলেন না। তারপর মেয়ে প্রীতির ঘরের পর্দার ফাঁক দিয়ে সামান্য একটু আলো দেখতে পেয়ে সেদিকেই গেলেন। ম্যানেজার সাহেব উন্মাদের মত চিৎকার করে উঠলেন; জন, আই উইল কিল ইউ।

মেয়ে প্রীতি আর খানসামা জনকে এমন পরিস্থিতিতে ম্যানেজার সাহেব দেখলেন যে উনি সত্যি আর স্বাভাবিক থাকতে পারলেন না। পাগলের মত ছুটে এলেন সামনের দিকে। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকলেন। রাইফেলটা দেখতে পেলেন না। আলমারির লকার থেকে রিভলবার বের করলেন। গুলী ভরলেন। এগিয়ে গেলেন মেয়ের ঘরের দিকে।

প্রীতি জনকে আড়াল করলেও জনের হাতের রাইফেলটা ম্যানেজার সাহেব দেখতে পেলেন।

ম্যানেজার সাহেব গর্জে উঠলেন, প্রীতি, সরে যাও। আই মাস্ট কিল

ছ্যাট বীস্ট। জানোয়ারটাকে মারতেই হবে। প্রীতি চিৎকার করে উঠল, ড্যাডি জন আমার স্বামী।

ননসেন্স।

ইয়েস ড্যাডি, জন ইজ মাই ····

প্রীতিকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই পিছন থেকে জন একটু বিদ্রূপ করে বললো, প্রীতি ইজ প্রেগন্যাণ্ট। আর ক'মাস পরেই·····

স্টপ ! বাস্টার্ড !

জন পাশ থেকে মুখখানা একটু বের করে বলে, সত্যি, আপনার নাতি হবে।

এ নাটক বেশীক্ষণ চলেনি। মাত্র মিনিট দশেক। নাটকের অভিনয় শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের উপর ম্যানেজার সাহেব, জন আর প্রীতির মৃতদেহ গড়িয়ে পড়ল।

খবরের একেবারে শেষে বলা হয়েছে, পুলিশ প্রীতির ঘর থেকে ওদের বিয়ের ম্যারেজ সার্টিফিকেট উদ্ধার করেছে এবং জানা গেছে, মাস ছয়েক আগে কলকাতায় ওদের বিয়ে হয়।

খবরটা পড়া শেষ হতেই মিঃ সোম যেন প্রীতিকে চোখের সামনে দেখতে পেলেন। জনকে ভালবাসার মধ্যে তার কোন দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, সংশয় নেই। মিঃ সোম যেন স্পষ্ট শুনতে পেলেন সেই সুন্দরী, শিক্ষিতা, আধুনিকা মুক্তকণ্ঠে বলছে, আই ইনটেণ্ড টু ম্যারি জন।

কতক্ষণ যে উনি চুপচাপ বসেছিলেন, তা ওর নিজের খেয়াল নেই।

সাবিত্রী পাশে এসে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, বিনু মামা খাবার সামনে নিয়ে কতক্ষণ বসে থাকবেন ?

মিঃ সোম খুব আস্তে বললেন, তুমি যাও। আমি আসছি।

মিঃ সোম খাওয়া-দাওয়া করেই আবার এই ঘরে ফিরে এলেন। তারপর টেবিলের নীচের ড্রয়ার থেকে পুরানো চিঠির বাণ্ডিল বের করে কী যেন খুঁজতে লাগলেন। পোস্টকার্ড—ইনল্যাণ্ড লেটারগুলো পাশে সরিয়ে রেখে নানা রংয়ের, নানা সাইজের বহু খাম দেখার পর

হঠাৎ একটা এয়ার-মেল খাম হাতে পড়তেই উনি যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। হ্যাঁ, এর মধ্যেই প্রীতির চিঠিগুলো আছে।···

হাজার হোক আপনি ম্যারেজ অফিসার। আইনগতভাবে উপযুক্ত সাবালক ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়াই আপনার কাজ। মিঃ জন নিকোলাস ডায়াসের সঙ্গে আমার বিয়েও আপনার ওখানেই হয়েছে। আপনার সঙ্গে আমার ভাবাবেগের সম্পর্ক গড়ে ওঠার কোন অবকাশ নেই, ইচ্ছাও নেই। তবুও কলকাতা থেকে দিল্লী ফিরে এসেই আপনাকে চিঠি লিখতে ইচ্ছে করল বলেই এই চিঠি লিখছি।

জনকে বিয়ে করার জন্য মাত্র দু'দিনই আপনার ওখানে গিয়েছি। এই সামান্য সময়ের জন্য দেখা হলেও আপনাকে আমার ভাল লেগেছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই অপরের ব্যাপারে একটু বেশী উৎসাহী; মেয়েদের ব্যাপারে আগ্রহ ও উৎসাহ প্রায় সীমাহীন। আপনাকে দেখে মনে হয়েছে, আপনি এই পর্যায়ের না। তাই আপনাকে কিছু জানাতে ইচ্ছে করছে।

খুব ছোটবেলার কথা আমার মনে নেই। শুধু মনে আছে, আমি প্রায় সারা দিনই একটা ঘরের মধ্যে বন্দিনী হয়ে থাকতাম। আমার প্রচুর খেলনা ছিল আর ছিল একটা কালো মোটা আয়া। নতুন নতুন খেলনা নিয়ে খেলতে ভালই লাগত; কিন্তু আমার মত শিশুর কাছে নতুন খেলনা পুরানো হতে বেশী সময় লাগত না। খেলনা পুরানো হলেই আমার মন খারাপ হয়ে যেতো। আয়া আমাকে ঠিকমত খেতে দিলেও কোনদিনই আদর করত না বলে ওর উপর ভীষণ রাগ হতো। তবে হ্যাঁ, রোজ বিকেলে ও আমাকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতো। বোম্বের কোলাবার ঐ সমুদ্রদর্শনই আমার শৈশবের একমাত্র সুখ-স্মৃতি।

বাবার সঙ্গে আমার রোজ দু'একবার দেখা হলেও পিতৃস্নেহের স্বাদ উপভোগ করেছি বলে মনে পড়ে না। ঐ অতি শৈশবেই আমি অনুভব করতাম, উনি আমাকে ভালবাসেন না।

মোটামুটি ঐ রকম অনাদর-হতাদরেই আমার জীবনের প্রথম কয়েকটা বছর কেটে গেল। তারপরের কয়েকটা বছর কাটল ব্যাঙ্গালোর-মাদ্রাজ-কোচিনে। ইতিমধ্যে শুরু হল আমার লেখাপড়া। স্কুলের সময়টা খুবই আনন্দে কাটত। ক্লাশের প্রত্যেকটা মেয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হলো। কত হাসিঠাট্টা খেলাধূলা করতাম ওদের সঙ্গে। তাছাড়া সিস্টাররাও আমাকে খুব স্নেহ করতেন।

এই সময়ই আমি জানতে পারলাম, আমার মা অত্যন্ত অহংকারী ও বদমেজাজের ছিলেন বলে সংসার ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু কেন জানি না কথাটা আমার একটুও বিশ্বাস হলো না। মার ব্যাপারে বাবার ঔদাসীন্য ও নোংরা মন্তব্য শুনলে আমার গা জ্বলত, কিন্তু ভয়ে কিছু বলতে পারতাম না। তাছাড়া বাবাকে আমার একটুও ভাল লাগত না। উনি আমার জন্য শুধু অর্থব্যয় করা ছাড়া আর কিছুই করেন নি।

আরো একটু বয়স বাড়ার পর আমি বেশ বুঝতে পারলাম, আমার বাবা চরিত্রহীন। ছোটবেলা থেকেই দেখছি, বাবা ভাল চাকরি করেন ও প্রচুর আয়ও করেন। সর্বত্রই দু'একজন অধস্তন কর্মচারীর স্ত্রীর সঙ্গে বাবার অবৈধ সম্পর্ক ছিল। শুধু তাই নয়, আমাকে দেখাশুনার জন্য যেসব আয়ারা কাজ করেছে, রাত্রির অন্ধকারে তাদের ঘরে যেতেও বাবার রুচিতে বাধত না।

তখন আমরা কোচিনে থাকি। রোজি নামে একটা মেয়ে তখন আমাদের বাড়ীতে থাকে। বাবার অফিসের ড্রাইভার এ্যাব্রাহাম বাবার গাড়ী চালান ছাড়াও বাজার যেত ও আমাকে স্কুলে পৌঁছে দিত। অফিসের কাজে আটকে না পড়লে ও আমাকে ছুটির পর বাড়ীতেও পৌঁছে দিত। সন্ধ্যার পর এ্যাব্রাহাম গাড়ী রেখে সাইকেল চড়ে নিজের বাড়ী চলে যেতো। এই এ্যাব্রাহামই আমাকে সাইকেল চড়া শেখায়।

আমি তখন ক্লাশ ফাইভে পড়ি। নেহাত ছোট নয়। নিজের সব কাজই নিজে করতে পারি। রোজি সংসারের সব কাজ করত।

রোজি কালো হলেও দীর্ঘাঙ্গী ও সুন্দরী ছিল। বয়স তিরিশ-বত্রিশের মত হবে। দীর্ঘদিন একজন বাঙ্গালী ন্যাভাল অফিসারের বাড়ীতে কাজ করার জন্য বেশ ভাল রান্না শিখেছিল। রোজি ইংরেজি তো জানতই; তাছাড়া একটু-আধটু হিন্দী-বাংলাও বুঝতে পারত। সুতরাং ওকে পেয়ে ভালই হলো।

ওখানে আমাদের বাড়ীটা পুরানো হলেও বেশ বড় ছিল। অনেকগুলো ঘর। সামনে-পিছনে বিরাট লন; ছু'পাশে ফুলের বাগান।

বিকেলবেলায় স্কুল থেকে ফিরে কিছু খাওয়া-দাওয়া করার পরই আমি আর রেজি ব্যাডমিণ্টন খেলতাম। খেলাধূলার পর আমি আমার ঘরে চলে যেতাম; রোজি যেত রান্নাবান্না করতে। পড়াশুনা করতে করতে যখনই দেখতাম বাবার গাড়ী ঢুকছে, আমি তাড়াতাড়ি সামনের বারান্দায় চলে যেতাম। উনি অত্যন্ত মামুলি ছুটো-একটা কথা বলেই নিজের ঘরের দিকে চলে যেতেন। আমিও আমার ঘরে ফিরে আসতাম।

রাত্রে কদাচিৎ কখনও আমি আর বাবা একসঙ্গে ডিনার খেতাম। ডিনার খাবার পরই আমরা ছুজনে ছুজনের ঘরে চলে যেতাম এবং রাত্রে বাবার সঙ্গে আমার আর দেখা হতো না। অন্যান্য দিন বাবা একবার ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করতেন, কী করছ? পড়ছ?

হ্যাঁ।

গুড! ঘর থেকে বেরুবার আগে বলতেন, ঠিকমত খাওয়াদাওয়া করবে।

ব্যস্! আর নয়! বাবা সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরে চলে যেতেন।

কেন জানি না, বাবা কোনদিন আমাকে ওঁর ঘরে ডাকতেন না। আমি বেশ বুঝতে পারতাম, উনি পছন্দ করেন না আমি ওঁর ঘরে যাই। তাই আমিও কোনদিন ওঁর ঘরে যেতাম না। বাবাকে কিছু বলতে হলেই আমি রোজিকে দিয়ে বলে পাঠাতাম। তাই কখনও কখনও প্রয়োজনের জন্যই আমাকে রোজির ঘরে যেতে হতো।

সেদিন রাত্রে ডিনার খাবার সময় বাবা বললেন, কাল খুব ভোরে আমি ত্রিবান্দ্রম যাচ্ছি। সেখান থেকে মাদ্রাজ ঘুরে ফিরব।

ডিনারের পর আবার পড়তে বসলাম। পড়াশুনা শেষ করে শুতে যেতে বেশ রাত হলো। বোধহয় এগারটা। শোবার পর হঠাৎ মনে পড়ল, পরশুদিন স্কুলের মাইনে দিতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি উঠে রোজির ঘরে গেলাম; কিন্তু কোথায় রোজি? গেলাম কিচেনে। না, দরজা বন্ধ। ড্রইং রুমে গেলাম, ডাইনিং রুমে গেলাম, সব বারান্দাগুলো ঘুরলাম কিন্তু কোথাও রোজিকে দেখতে পেলাম না। ভাবলাম, বোধহয় লনে ঘোরাঘুরি করছে। এ পাশের লন ঘুরে ও পাশের লনে যেতেই চমকে উঠলাম। দেখি, বাবার ঘরের জানালা খোলা। আলো জ্বলছে। রোজি? হ্যাঁ, বাবার ঘরেই আছে কিন্তু ওদের দুজনকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে দেখলাম যে সেকথা আমি আপনাকে লিখতে পারব না।

যে বয়সে পৃথিবীর সবকিছুই সুন্দর মনে হয়, সব মানুষকেই ভাল লাগে, ঠিক সেই সময়ই আমার মন বিষিয়ে গেল। ঘেন্না হলো সব পুরুষদের উপর।

জন যখন আমাদের বাড়ীতে এলো তখনও আমার বয়স বেশী নয়। ইতিমধ্যে অনেক রোজির মধু খাবার পর বাবা হঠাৎ একবার বিলেত থেকে আমার নতুন মাকে নিয়ে এসেছেন। সে এক বিচিত্র পরিস্থিতি। বাবা আমাকে দূরে সরিয়ে রাখেন, নতুন মা আমার কাছে আসেন না, জনকেও আমি বিশ্বাস করি না।

বাবা অফিস যান; মাও বেরিয়ে পড়েন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে। কোনদিন ওরা লাঞ্চে বাড়ীতে আসেন, কোনদিন আসেন না। সন্ধ্যার পর দুজনেই নিয়মিত বাইরে যান ককটেল-ডিনার-রিসেপসন বা কোন পাঁচ তারার হোটেলে। ফিরে আসেন মধ্যরাত্রিতে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমন কি বছরের পর বছর এইভাবেই কেটে গেল। ইতিমধ্যে আবিষ্কার করলাম, জন পশু নয়, মানুষ। ওর

চরিত্রে স্নেহ-মায়া-মমতা আছে। আস্তে আস্তে উপলব্ধি করলাম, ও আমাকে স্নেহ করে, আমাকে ভালবাসে, আমার কল্যাণ কামনা করে।

জন আমার ঘরের দরজার ওপাশ থেকে বললো, ছোটা মেমসাব, পড়তে বসবে না?

না। ভাল লাগছে না।

শরীর খারাপ লাগছে?

না; শরীর ভালই আছে।

তাহলে ছোটা মেমসাব পড়তে বসো। জন একটু থেমে বলে, তোমাকে পড়তে দেখলে আমার খুব ভাল লাগে।

আমি এতক্ষণ জনের দিকে ফিরেও তাকাই নি, কিন্তু একথা শোনার পর ওর দিকে না তাকিয়ে পারলাম না। আমি কিছু বলার আগেই ও বললো, ছোটা মেমসাব, আমি সব বুঝতে পারি। তুমি লেখাপড়া করে বড় হলে সব দুঃখ ঘুচে যাবে।

আমি মুখ নীচু করে হাসি।

না, না, ছোটা মেমসাব, হাসির কথা নয়। যে মানুষ মন-প্রাণ দিয়ে লেখাপড়া করতে পারে, তাকে কোন দুঃখই ছুঁতে পারে না।

আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি করে জানলে?

জন সঙ্গে সঙ্গে দেশপাণ্ডে সাহেবের গল্প শুরু করে, লোকটা যেন বিদ্যের জাহাজ ছিল। ঘরভর্তি শুধু বই আর বই। কলেজে যাবার আগে, কলেজ থেকে ফিরে এসে সব সময় শুধু পড়তেন আর লিখতেন। কী বলব ছোটা মেমসাব, প্রফেসার সাহেব শুধু পড়াশুনা ছাড়া আর কিছুই জানতেন না।

তারপর?

প্রফেসার সাহেবের ছেলে আর পুত্রবধূ বিলেতে থাকত। বোম্বেতে প্রফেসার সাহেব আর তাঁর ওয়াইফ থাকতেন। তারপর হঠাৎ ওঁর স্ত্রী মারা গেলেন। আমি ভাবলাম, লোকটা বোধহয়

এবার সন্ন্যাসী হয়ে যাবে ; কিন্তু না, দু'একদিন পর থেকে প্রফেসার সাহেব আবার পড়াশুনা শুরু করে সব দুঃখ ভুলে গেলেন।

জন এবার আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, ছোটা মেমসাব, তুমি লেখাপড়া করো। দেখবে তোমার মনেও কোন দুঃখ নেই।

আপনি বিশ্বাস করুন, এই জনের জন্যই আমাকে লেখাপড়া করতে হয়। ও না থাকলে কিছুতেই আমার লেখাপড়া হতো না ; আমি কোনদিনই বি.এ.-এম.এ. পাস করতাম না।

কী হলো ছোটা মেমসাব ? এখনই শোবে নাকি ?

হ্যাঁ।

এখন তো মোটে সাড়ে ন'টা বাজে।

আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

পরীক্ষার আগে এত তাড়াতাড়ি ঘুম পেলে চলবে কেন ? আমি তোমার জন্য এক কাপ ব্ল্যাক কফি আনছি। খাও ; দেখবে ঘুম চলে গেছে।

জন কফি আনে। আমি কফি খাই। ও বলে, প্রত্যেক ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমি তোমাকে কফি দেব। তুমি পড়ে যাও ।

ফার্স্ট' ডিভিশনে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা পাস করার পর বাবা আমাকে তিন দিনের জন্য সিমলা নিয়ে গেলেন। আমার নতুন মা আমাকে একদিন বড় হোটেলে ডিনার খাওয়ালেন। আর জন ? ও আমাকে একখানা বাইবেল আর একটা শেফার্স কলম দিয়ে বলেছিল, ছোটা মেমসাব, আমি ক্রিশ্চিয়ান। অন্য ধর্মের কথা জানি না। তবে বাইবেলটা পড়ে দেখো, মনে শান্তি পাবে।

কিন্তু কলমটা দেবার কি দরকার ছিল ?

জন হেসে বললো, আমি তো মহা পণ্ডিত। ভেবেই পেলাম না কোন বই তোমার ভাল লাগবে। তাই মনে হলো, কলম দেওয়াই সব চাইতে ভাল।

আমি অবাক হয়ে ওকে দেখি।

ও একটু আনমনা হয়। তারপর বলে, ছোটা মেমসাব, আমি নিশ্চয়ই তোমাদের এখানে চিরকাল চাকরি করব না। তখন এই কলম দিয়ে লিখতে গেলেই তোমার মনে পড়বে, জন চেয়েছিল তুমি অনেক লেখাপড়া শিখে বড় হও।

জনের কথা লিখতে গেলে অনেক কিছু মনে পড়ে। আমরা তখন কলকাতায়। আমি ব্রেবোর্নে পড়ি। বাবা অফিসের কাজে কয়েক দিনের জন্য গৌহাটি-শিলং-ইম্ফল ঘুরতে গেছেন। নতুন মা-ও তাঁর সঙ্গিনী হয়েছেন। বাবা নতুন মা যেদিন রওনা হলেন, সেদিন রাত্রে শুতে যাবার আগে জন আমাকে বললো, ছোটা মেমসাব, তুমি দরজাটা ভিতর থেকে লক করে দিও।

কেন ?

কেন আবার ? আজ তো সাহেব-মেমসাহেব নেই, তাই··· ··

তুমি তো আছো।

হাজার হোক আমি অশিক্ষিত খানসামা। আমার মাথায় কখন বদ বুদ্ধি চাপবে, তা কি কেউ বলতে পারে ?

আমি হেসে বললাম, যে আমাকে বাইবেল উপহার দিয়েছে, সে কোনদিনই আমার ক্ষতি করবে না।

তুমি সত্যি তাই মনে কর ?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমি জানি তুমি আমাকে এত ভালবাসো যে তুমি আমার ঘরে শুলেও আমার কোন ক্ষতি করবে না।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই জন আমার দুটো হাত চেপে ধরে বললো, ঠিক বলেছ ছোটা মেমসাব, আমি সত্যি তোমাকে খুব ভালবাসি। আমার দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

তা আমি জানি। এবার আমি ওর আত্মতৃপ্তিভরা উজ্জ্বল মুখখানার দিকে তাকিয়ে বললাম, আমার একটা অনুরোধ রাখবে ?

নিশ্চয়ই রাখব।

আজ থেকে তুমি আর আমাকে ছোটা মেমসাব বলবে না ; তুমি আমাকে প্রীতি বলেই ডাকবে।

কি বলছ তুমি ?

হ্যাঁ জন, ঠিকই বলছি।

বাট্ ··

কোন কিন্তু নয় ; আগে কথা দাও।

জন একটু ভেবে বললো, ঠিক আছে, তোমাকে প্রীতি বলেই ডাকব, কিন্তু সাহেব বা মেমসাহেবের সামনে নয়।

জানেন মিঃ সোম, সেই রাত্রি থেকে আমার আর জনের মধ্যে বন্ধুত্বের নতুন অধ্যায় শুরু হলো।

আচ্ছা জন, তুমি বিয়ে করনি কেন ?

আমাকে তো দেখতে ভাল নয়। কোন্ মেয়ে আমাকে ভালবাসবে ?

শুধু চেহারাটাই কি সব ?

আমার বাইরের চেহারার মত ভিতরের চেহারাটাও যে আগ্‌লি নয়, তা কে বলতে পারে ?

ডোণ্ট সে ছ্যাট্ ঃ তোমার মত মানুষ ক'টা পাওয়া যায় ?

সত্যি বলছি মিঃ সোম, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আমি আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম, আমার নতুন মা আমাকে ঈর্ষা করেন। উনি আমাকে যত বেশী ঈর্ষা করতেন, বাবাও তত বেশী উপেক্ষা করতে শুরু করলেন। দিনের পর দিন ওরা দুজনের কেউই আমার সঙ্গে কথা বলার সময় পেতেন না। একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া বা ঘোরাঘুরি একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। ভাবতে পারেন আমার মানসিক অবস্থা ? আমার জ্বালা ? আমার অব্যক্ত বেদনা ?

ওঁরা আমাকে যত বেশী দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, জন আর আমি তত বেশী কাছাকাছি এসেছি। ওঁরা আমাকে যত বেশী অপমান করেছেন,

জন আমাকে তত বেশী সম্মান দিয়েছে। ওঁদের যন্ত্রণার জ্বালাকে ভুলিয়ে দিয়েছে জনের ভালবাসা আর সমবেদনা।

আমার পিতৃদেব আমাকে শুধু স্নেহ-ভালবাসা থেকেই বঞ্চিত করেন নি ; বঞ্চিত করেছেন শুভ বুদ্ধি থেকে। তিনি আমার জন্মদাতা হলেও তাঁর চরিত্রের কোন গুণই আমি গ্রহণীয় মনে করি নি। শুধু তাই নয়। বাবাকে আমি শ্রদ্ধাও করি না, ভালবাসিও না। ·····

চিঠিখানা পড়তে পড়তে মিঃ সোম আনমনা হয়ে পড়েন। মনে পড়ে সেই তুটি দিনের কথা। অনেক ছেলেমেয়েরই বিয়ে হলো ওর সামনে কিন্তু এমন আত্মপ্রত্যয় নিয়ে আর কোন মেয়েকে বিয়ে করতে দেখেন নি। ওদের বিয়ে দেবার পর মিঃ সোম জনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বিবাহিত জীবন কিভাবে কাটাবার পরিকল্পনা করেছেন ?

জন হেসে জবাব দেন, প্রীতি অনেক ঐশ্বর্য দেখেছে। ওসবের প্রতি ওর কোন মোহ নেই। ও আমার স্ত্রী, আমার সন্তানের মা হতে চায় ; ওর আর কোন দাবি বা আশা নেই।

মিঃ সোম প্রীতির দিকে তাকাতেই ও বললো, ভবিষ্যতে দেখবেন আমি কিভাবে স্বামী ও সন্তানদের সুখী করি।

মিঃ সোম বললেন, নিশ্চয়ই আপনারা সুখী হবেন। জন একটু হেসে বললো, প্রীতিকে সুখী করা খুবই সহজ।

সোম সাহেব প্রশ্ন করলেন, তাই নাকি ?

হ্যাঁ ; ও তো কিছু চায় না, শুধু ভালবাসা চায়। জন একটু থেমে বললো, ঐ ভালবাসা ছাড়া আমারও তো আর কিছুই দেবার ক্ষমতা নেই !

সেদিন বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হবার পর সামান্য কিছুক্ষণের জন্য কথাবার্তা হয়েছিল। সব কথা মিঃ সোমের মনে নেই কিন্তু প্রীতির একটা কথা কোনদিন উনি ভুলবেন না। ও বলেছিল, মিঃ সোম, আজ এই বিয়ের দিনই আপনাকে একটা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আমাদের

সন্তানদের কতদূর লেখাপড়া হবে, বলতে পারব না ; তাদের সম্মান-প্রতিপত্তি-ঐশ্বর্য হবে কিনা তাও জানি না কিন্তু জোর করে বলতে পারি আমাদের সন্তানরা নিশ্চয়ই ভদ্র, সভ্য ও চরিত্রবান হবে।

প্রীতির আত্মপ্রত্যয়ের কথা ভাবতে গিয়েও মিঃ সোম বিস্মিত হন। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন। ভাবেন ওদের কথা। তারপর আবার ওর চিঠিখানা পড়তে শুরু করেন।

···এ সংসারে সব মেয়েরাই বাবা ও দাদাদের মধ্য দিয়েই পুরুষদের সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলে। এরপর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সে ধারণার পরিবর্তন হয়। বাবার কথা তো আগেই লিখেছি। বাবার দৌলতে আমি যে সমাজে বিচরণ করার সুযোগ পেয়েছি এবং পুরুষদের সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, তাও বিশেষ সুখকর নয়। বাবার হুকুমে, আমার নতুন মা-র তাগিদে আমাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন কোন পার্টি বা আউটিং'এ যেতেই হয়েছে। প্রতিবারই অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসেছি এবং যে সমাজে আমি জন্মেছি, তার প্রতি আমার ঘৃণা আরো তীব্র হয়েছে। এই ঐশ্বর্যসম্পন্ন মানুষরূপী পশুগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্যও আমি জনকে বিয়ে করছি। ··

প্রীতির এই দীর্ঘ চিঠির উত্তরে মিঃ সোম সামান্য কয়েক লাইনের চিঠি লিখেছিলেন। দিন দশেকের মধ্যেই আবার প্রীতির চিঠি এসেছিল। এই চিঠির শেষে সে লিখেছিল, জনকে বিয়ে করে আমি যে ভুল করিনি, তা প্রতি পদক্ষেপে বুঝতে পারছি। এ সংসারে মানুষ যে কত মহৎ হতে পারে, তা জনকে বিয়ে না করলে জানতে পারতাম না। কিন্তু এমন স্বামীর প্রতিও আমি আমার কর্তব্য পালন করতে পারছি না। তাই ঠিক করেছি, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা এ দেশ ছেড়ে চলে যাব।···

ওদের কথা ভাবতে গিয়ে মিঃ সোমের দুটি চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। হঠাৎ কলিং বেল বাজতেই তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে পড়েন।

বিয়ের নোটিশ দেবার ফর্মে সুবোধবাবু আর শিখা সই করতেই কণিকা বললো, যাক, প্রথম পর্ব শেষ হলো। এবার তোমাদের বিয়ে দিয়ে হনিমুনে পাঠাবার পর আমার ছুটি।

মিঃ সোম হাসতে হাসতে বললেন, মনে হচ্ছে, আপনিই ঘটকালি করে এ বিয়ে দিচ্ছেন।

কণিকা হাসতে হাসতে বললো, তাহলে শুনুন। আমরা তিনজনেই এক অফিসের এক সেকশনে কাজ করি। শিখা আমার সবচাইতে ক্লোজ ফ্রেণ্ড। আস্তে আস্তে আমাদের ছুজনের সঙ্গেই সুবোধের বেশ ভাব হয়। কণিকা এবার মুহূর্তের জন্য ওদের ছুজনকে দেখে নিয়ে বললো, প্রথম প্রথম ভাবতাম, ও বোধহয় আমাকেই ভালবাসে……

ওর কথায় তিনজনেই হাসেন।

ওদের হাসি দেখে কণিকা আরো সিরিয়াস হয়ে মিঃ সোমকে বললো, সত্যি বলছি, আগে আমার তাই ধারণা ছিল এবং সেজন্যই সিনেমা দেখার সময় সুবোধের হাতের উপর আমি হাত রাখতাম।···

কণিকার কথায় ওরা তিনজনে আরো জোরে হেসে ওঠেন।

কণিকা ওদের হাসি গ্রাহ্যও করে না। বলে, অফিসের ক্যান্টিনে, রাস্তাঘাটে বা আউট্রাম ঘাটের ধারে ঘুরেফিরে বেড়াবার সময় কতবার সুবোধকে গদগদ হয়ে কত কথা বলেছি, কিন্তু সেসব ও আমলই দেয় নি।

মিঃ সোম গম্ভীর হয়ে বলেন, তাই নাকি?

কণিকা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, আমার ছুখের কথা শুনলে আপনার চোখে জল আসবে।···

বলেন কী?

সুবোধের দিকে তাকিয়ে কত মুচকি হেসেছি, কত সময় ইসারায় কত কি বলেছি কিন্তু ও এমন ন্যাকামি করত যেন আমাকে চেনেই না।

শিখা মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললো, তুই প্রেমপত্র লিখেও জবাব পাস নি, সে কথা বলবি না?

কণিকা কপট গাম্ভীর্য নিয়ে বললো, নিজের মুখে নিজের ব্যর্থতার কথা আর কত বলব ?

মিঃ সোম হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলেন, সুবোধবাবু আপনি এত উদাসীন ছিলেন ?

কণিকা আর উৎসাহ না পেয়ে বললো, শেষপর্যন্ত বুঝলাম, না, আমার কোন চান্স নেই।··· ··

মিঃ সোম হাসতে হাসতে প্রশ্ন করেন, তাই বুঝি আপনি ওদের বিয়ের ঘটকালি করলেন ?

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর শিখা বললেন, এবার আমাকেই ওর বিয়ের ঘটকালি করতে হবে।

মিঃ সোম বললেন, সে বিয়েও যেন আমার এখানেই হয়।

শিখা বললেন, সে আর বলতে হবে না।

আরো বেশ কিছুক্ষণ হাসিঠাট্টা গল্পগুজবের পর কণিকা বললেন, ওদের রেজেস্ট্রি বিয়ে হলেও লগ্ন দেখেই বিয়ে হবে।

মিঃ সোম আশ্বাস দেন, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।

ওরা চলে গেলেও মিঃ সোম ওদের কথাই ভাবেন। তিনজনকেই ওর ভাল লেগেছে। যেমন হাসিখুশি প্রাণবন্ত, সেই রকম ভদ্র, সভ্য, মার্জিত। কারুর মধ্যেই যেন কোন গ্লানি নেই।

দিন পনের পরে শিখার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে কণিকা এসে বলে গেল, সাতাশে শ্রাবণ বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। সাতটা বাহান্ন থেকে নটা আঠারোর মধ্যে বিয়ে হবে।

মিঃ সোম বললেন, ঠিক আছে।

আমরা আপনার সামনে সামান্য একটু অনুষ্ঠানও করব।

তাতেও আপত্তি নেই।

সাতাশে শ্রাবণ !

সাড়ে সাতটা বাজতে না বাজতেই কণিকার নেতৃত্বে পনের-

কুড়ি জনের এক পার্টি এসে হাজির। সুবোধবাবু বরের বেশে ও শিখা নববধূর সাজে এসেছে। সঙ্গে দুপক্ষের কিছু আত্মীয়স্বজন ছাড়াও অফিসের বন্ধুবান্ধবরা এসেছেন।

প্রথমে আইন অনুসারে বিয়ে হলো। তারপর সাত পাক ঘোরা, মালাবদল। এক ব্রাহ্মণ বৈদিক মন্ত্রও পাঠ করলেন। সবশেষে মিষ্টি-মুখের ব্যবস্থা।

মিঃ সোমের এখানে ঠিক এ ধরনের বিয়ে হয়নি। তাই মাঝে মাঝেই এই বিয়ের স্মৃতি ওর মনে পড়ে।

তিন-চার মাস পরে মিঃ সোম আর তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী কিছু কেনাকাটা করতে বেরিয়ে সুবোধবাবু ও কণিকাকে দেখলেন। ওরা টের না পেলেও মিঃ সোম মুগ্ধ হয়ে ওদের দেখেন, ওদের কথা শোনেন।

সুবোধবাবু একটা জামার কাপড় হাতে তুলতেই কণিকা বললেন, না না, এটা তোমাকে মানাবে না।

সুবোধবাবু বললেন, অফিসের কাকে যেন এই ধরনের জামা পরতে দেখে শিখার খুব পছন্দ হয়েছিল। ও বলছিল—

শিখার পছন্দের কথা বলো না।

সুবোধবাবু আর কথা বলেন না। কণিকা জামার কাপড় পছন্দ করে বললো, দর্জিকে ঠিকমত বুঝিয়ে বলো। আগের জামার মত হলেই কেলেঙ্কারী।

মিঃ সোম রাস্তাঘাটে কদাচিৎ কখনও সুবোধবাবু ও কণিকাকে একসঙ্গে দেখতেন কিন্তু তার কোন বিশেষ তাৎপর্য বুঝতে পারতেন না। বছরখানেক পরে হঠাৎ একদিন ওরা দুজনে মিঃ সোমের কাছে এসে বিয়ের নোটিশ দিতেই সব তাৎপর্য বোঝা গেল।

মিঃ সোমের মনে অনেক প্রশ্ন এলেও উনি কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। উনি জানেন, এসব নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। এসব ব্যাপারে তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানো মোটেই উচিত নয়। তবে সুবোধবাবু

নিজেই কোর্টের অর্ডার দেখিয়ে বললেন, জানেন মিঃ সোম, যা চকচক করে তা অধিকাংশ সময়েই সোনা হয় না।

মিঃ সোম একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, গুরুজনরা তো তাই বলেন।

এবার কণিকা বললো, শিখা মেয়েটা ভাল কিন্তু কিভাবে স্বামীকে সুখী করতে হয় তা জানে না।

মিঃ সোম বললেন, অনেক মেয়ে যেমন স্বামীকে সুখী করতে জানেন না, সেইরকম অনেক স্বামীও জানেন না কিভাবে স্ত্রীকে সুখী করতে হয়।

কণিকা বললো, তা ঠিক।

এবার মিঃ সোম বললেন, আসল কথা, আমরা সবাই যদি একটু বিচার-বিবেচনা করে চলতাম তাহলে এই পৃথিবীটা আরো অনেক সুন্দর হতে পারতো।

ওরা চলে গেলেও মিঃ সোমের মনে কিছু প্রশ্ন, একটু বিস্বাদ থেকে গেল।

তারপর একদিন ওদের বিয়ে হলো। সাক্ষী হিসেবে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সুবোধবাবুর সঙ্গে শিখার বিয়ের সময় আসেন নি। অনুষ্ঠান শেষ হতেই ওরা চলে গেলেন। সুবোধবাবু আর কণিকা কিছু সময় গল্পগুজব করলেন।

কোন ভূমিকা না করেই সুবোধবাবু বললেন, কোনদিন ভাবিনি বিয়ে করব কিন্তু এমনই কপাল যে···

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই কণিকা বললেন, জানেন মিঃ সোম, আমি সত্যি ভাবিনি আমি সুবোধকে বিয়ে করব।

মিঃ সোম একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সবই অদৃষ্ট।

কণিকা আবার বললেন, শিখা সত্যি ভাল মেয়ে। ওর অনেক গুণ আছে, কিন্তু সত্যি সংসার করতে জানে না। বিয়ের পর সুবোধ যেভাবে অফিস যেতো, তা দেখলে আপনি অবাক হতেন।

শিখার নিন্দা শুনতে মিঃ সোমের একটুও উৎসাহ ছিল না। তাই উনি বললেন, আপনাদের এসব ব্যক্তিগত কথা আমাকে না বলাই ভাল। আমি চাই আপনারা সবাই সুখী থাকুন।

সুবোধবাবু বললেন, আপনি আমাদের তিনজনকেই চেনেন বলেই কণিকা এসব বলছে।

মিঃ সোম একটু হেসে বললেন, আপনাদের তিনজনকে চিনি বলেই তো এসব শুনতে মন চাইছে না।

আর বিশেষ কিছু না বলে একটু পরেই ওরা দুজনে চলে গেলেন।

দিন দশ-পনের পরে হঠাৎ শিখা এসে হাজির। মিঃ সোম অবাক হয়ে বললেন, আপনি।

শিখা একটু হেসে বললো, এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম তাই ভাবলাম দেখা করে যাই।

খুব ভাল করেছেন।

আপনি কেমন আছেন?

আমি একরকম আছি। আপনি কেমন আছেন, তাই বলুন।

শিখা একটু ম্লান হেসে বললো, আমি কেমন আছি, তা কী আপনি জানেন না?

হ্যাঁ মানে···

আপনি তো জানেন, আমাদের ডিভোর্স হয়েছে?

মিঃ সোম মাথা নাড়লেন।

কণিকার সঙ্গে সুবোধের বিয়ে হয়েছে, তা তো নিশ্চয়ই জানেন?

মিঃ সোম মুখ নীচু করে বললেন, আমার এখানেই ওদের বিয়ে হয়েছে।

শিখা আবার একটু হাসলেন। বললেন, জানি।

এবার মিঃ সোম মুখ তুলে শিখার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, এরকম কেন হলো বলুন তো?

সত্যি শুনতে চান?

যদি আপনার আপত্তি না থাকে তো···

না, না, একটুও আপত্তি নেই। শিখা একটু থেমে বললো, আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, কণিকা সব ব্যাপারেই নিজেকে ইমপোজ করতে চায়?

হ্যাঁ, তা লক্ষ্য করেছি।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে যদি একটা মেয়ে এসে সব সময় নিজেকে ইম্পোজ করে এবং স্বামী তা মেনে নেয়, তাহলে কী সংসার করা যায়?

তা ঠিক।

শিখা একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, আপনি শুনে অবাক হবেন সুবোধ কি জামা-প্যান্ট পরবে, তাও কণিকা বলে দিত।

হঠাৎ সেই দোকানের স্মৃতি মনে পড়ল ওর। তবে মুখে কিছু বললেন না।

শিখা বলে যায়, প্রত্যেক দিন অফিসের পর কণিকা আমাদের সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে আসত এবং সংসারের প্রতিটি ব্যাপারে আমাকে নিন্দা করত। আমি যা রান্না করব, তা ওর পছন্দ নয়; আমি যে বেডকভার কিনব, তা ওর পছন্দ নয়, আমি যে জামাকাপড় পরব, তাও ওর পছন্দ নয়।···

সুবোধবাবু কিছু বলতেন না?

কণিকার রুচির প্রতি, বুদ্ধির প্রতি ওর এমনই শ্রদ্ধা যে ও কখনই কোন ব্যাপারে প্রতিবাদ করত না।

আশ্চর্য ব্যাপার।

এতেই আশ্চর্য হচ্ছেন? শিখা একটু হেসে বললো, আপনি শুনলে অবাক হবেন, আমাদের স্বামী-স্ত্রীর একান্তই গোপনীয় ও প্রাইভেট ব্যাপারেও···

থাক, থাক, ওসব আর বলবেন না। মিঃ সোম একটু থেমে বললেন, আপনি ডিভোর্স করে ভালই করেছেন কিন্তু···। মিঃ সোম কথাটা শেষ করতে পারেন না। একটু দ্বিধা হয়।

শিখাই জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কী ?

একটু সঙ্কোচের সঙ্গে মিঃ সোম বললেন, আপনি এভাবে কতদিন থাকবেন ?

কেন ? বেশ তো আছি।

হাজার হোক আপনার বয়স তো বেশী নয়, তার উপর কিছুদিন বিবাহিত জীবন কাটিয়েছেন।

তাতে কী হলো ?

এখন বোধহয় আপনার পক্ষে বেশীদিন একলা থাকা সম্ভব নয়।

আমার তো এখন একলা থাকতে বরং ভালই লাগছে।

এবার মিঃ সোম জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা, আপনারা তিনজনে কী এখনও একই সেকশনে কাজ করছেন ?

শিখা একটু হেসে বললো, না। কণিকা চাকরি ছেড়ে দিয়েছে; আর সুবোধ অন্য সেকশনে চলে গেছে।

একটু চুপ করে থাকার পর শিখা আবার বলে, সুবোধকে বিয়ে করার পর কণিকার আর আমাদের অফিসে চাকরি করা সম্ভব নয়।

কেন ?

শিখা একটু হেসে বলে, এম. এ. পাস করার পর চাকরি শুরু করি কিন্তু তবু মাঝে মাঝে মনে হতো, কোন কলেজে পড়াবার সুযোগ পেলেই ভাল হতো। তাই মাঝে মাঝেই আমার এক অধ্যাপিকার বাড়ীতে যেতাম। উনি অবশ্য সব সময় বলতেন, মফঃস্বল কলেজে চাকরি করার চাইতে যে চাকরি পেয়েছ, তা অনেক ভাল। তবু আমি মাঝে মাঝে ওঁর কাছে যেতাম।

তারপর ?

ক'বছর আগে এক রবিবার সকালবেলায় ঐ শিবানীদির ওখানে যেতেই—

আরে শিখা, এসো, এসো। তোমার কথাই ভাবছিলাম।

কেন শিবানী দি ? কলকাতার কোন কলেজে···

শিখা, না। আমার জানাশুনা একটি মেয়ে বড়ই বিপদগ্রস্ত। তাই ভাবছিলাম তুমি যদি চেষ্টা করে মেয়েটিকে তোমাদের অফিসে ঢোকাতে পারতে তাহলে খুব ভাল হতো।

সেও বুঝি আপনার ছাত্রী ?

না, কণিকা আমার ছাত্রী না কিন্তু এক ছাত্রীর সঙ্গে এককালে আমার কাছে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতো।

মেয়েটির নাম বুঝি কণিকা ?

হ্যাঁ।

উনিও কি এম. এ পাস ?

না ; বি. এ.।

আমাদের ওখানে কোন ভ্যাকান্সী আছে কিনা জানি না, তবে আপনি যখন বলছেন তখন নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, চেষ্টা করো। কণিকা চাকরি না পেলে সত্যি খুব বিপদে পড়বে। শিবানীদি খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বেচারা যেভাবে দিন কাটাচ্ছে সে আর বলার নয়।

শিখা একটু হেসে বললো, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি আমার কথায় কণিকার চাকরি হবে ; কিন্তু ডিরেক্টর সাহেবকে অনুরোধ করতেই উনি রাজী হয়ে গেলেন।

মিঃ সোম অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, তাহলে আপনিই ওকে চাকরি দেন ?

হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।

সুবোধবাবু কতকাল আপনাদের অফিসে চাকরি করছেন ?

আমার বছর দুই আগে থেকে ও কাজ করছে।

মিঃ সোম আপন মনে একটু হাসেন। কি যেন ভাবেন। কয়েক মিনিট কেউই কোন কথা বলেন না। তারপর শিখাই প্রথম কথা বলে, কী ভাবছেন এত গভীরভাবে ?

আর কি ভাবব ? আপনার কথাই ভাবছি।

এবার শিখা একটু হেসে প্রশ্ন করল, শুধু আমার কথাই ভাবছেন? কণিকার কথা ভাবছেন না?

নিশ্চয়ই ভাবছি।

কী ভাবছেন?

ভাবছি যে আপনার দ্বারা এত উপকৃত হয়েছে, সে কিভাবে আপনার সর্বনাশ করল।

শিখা আবার একটু হাসে। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এসব কথা কোনদিন কাউকে বলিনি, কিন্তু আজ আপনাকে বলছি, শুধু চাকরি দিয়ে নয়, সে সময় আরো অনেক ভাবে কণিকাকে সাহায্য করেছিলাম। তাছাড়া কণিকাকে সত্যি আমি ভালবেসেছিলাম।

তা আমি প্রথম দিনই বুঝেছিলাম।

আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে শিখা চলে গেল। যাবার আগে মিঃ সোম বললেন, এদিকে এলে নিশ্চয়ই আসবেন। খুব খুশী হবো।

হ্যাঁ, আসব।

সত্যি এদিকে কোন কাজকর্মে এলেই শিখা আসত। একটু গল্প-গুজব করে চলে যেত। সব সময় একলা আসত না, মাঝে মাঝে অফিসের কেউ-না-কেউ সঙ্গে থাকতেন। মিস ঘোষ বা মিসেস ব্যানার্জি ছাড়াও অলকবাবু কখনও কখনও শিখার সঙ্গে আসতেন।

এইরকমই কাউকে সঙ্গে এনে শিখা একবার জানিয়ে গেল, বিয়ের ছ'মাসের মধ্যেই কণিকার মেয়ে হয়েছে। হাসপাতালে আছে, সময় হলে একবার দেখে আসবেন।

মিঃ সোম কোন মন্তব্য করলেন না, শুধু একটু হাসলেন।

এইভাবে আরো মাসছয়েক কেটে গেল।

তারপর একদিন বিকেলে হঠাৎ শিখা আর অলকবাবু এসে হাজির!

দু-পাঁচ মিনিট অন্যান্য কথা বলার পর শিখা বললো, আপনি ঠিকই বলেছিলেন, একলা একলা বেশীদিন থাকা যায় না।

মিঃ সোম বললেন, একলা থাকা তো মানুষের ধর্ম নয়।

শিখা একটু মুখ নীচু করে বললো, আমাদের অফিসের সবাই অলককে ভালবাসেন। আমারও ভাল লাগে; কিন্তু জানতাম না, ও আমাকে ভালবাসে।

মিঃ সোম ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, একটা কথা বলব?

অলকবাবু বললেন, নিশ্চয়ই।

মিঃ সোমের মুখে তখনও হাসি। উনি অলকের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা দুজনে যেদিন প্রথম আমার এখানে আসেন, সেদিন রাত্রেই আমার স্ত্রী আমাকে বলেছিলেন—

শিখার সঙ্গে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন, তার নাম কী?

অলকবাবু।

ভদ্রলোককে দেখলেই মনে হয় খুব ভাল লোক।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। সাবিত্রী একটু থেমে বললো, ভাল লোক না হলে এমন সৌম্য দর্শন হয় না।

মিঃ সোম বললেন, হ্যাঁ, ওকে দেখতে ভারী সুন্দর।

শুধু সুন্দর নয়; ওর দুটো চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, ভদ্রলোক অত্যন্ত সৎ।

অলকবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমারও বেশ লাগল।

সাবিত্রী এবার আক্ষেপ করে বলে, শিখা যদি সুবোধবাবুকে বিয়ে না করে এই ভদ্রলোককে বিয়ে করতো, তাহলে মেয়েটাকে এত দুঃখ ভোগ করতে হতো না।

মিঃ সোমের কাছে ওর স্ত্রীর কথা শুনে ওরা দুজনেই অত্যন্ত খুশি হলো কিন্তু লজ্জায় কেউই কোন কথা বললেন না।

মিঃ সোম জানতে চাইলেন, অলকবাবুর সঙ্গেই আপনার বিয়ে হচ্ছে তো?

শিখা মুখ নীচু করে বললো, হ্যাঁ, অলক আমার দায়িত্ব নিতে রাজী হয়েছে।

খুব ভাল কথা। আমি চাই, আপনি বিয়ে করুন, সুখে থাকুন।

সেদিনই ওরা বিয়ের নোটিশ দিয়ে গেলেন। তারপর একদিন ওদের বিয়েও হলো।

এইভাবেই রমেন সোমের জীবন চলে। ছোট তিনখানা ঘরের ফ্ল্যাটে বাস করেও বিরাট সংসারের রূপ দেখেন। দুজনের ছোট সংসার। এক মাত্র মেয়ে বিয়ের পরই জামাইয়ের সঙ্গে কানাডা চলে গেছে। তবু ওদের সংসার দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ঐ ছোট একটা সাইনবোর্ডের কল্যাণে এ সংসার বেশ বড় হয়েছে।

প্রবীরবাবুর প্রমোশন হয়েছে। তাকে মাঝে মাঝেই কলকাতায় যেতে হয়। ভি. আই. পি. রোডের ফ্ল্যাটে সুমিত্রা একলা থাকতে পারেন না বলে এখানেই চলে আসেন। সাবিত্রী এর আগে স্বামীকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারেন নি। এখন তিনি মাঝে মাঝে প্রবীরবাবুর সঙ্গে দু'চার দিনের জন্য এদিক ওদিক চলে যান। সাবিত্রী সুমিত্রাকেও সঙ্গে টানতে চেষ্টা করেন কিন্তু উনি যান না। বলে, না বৌদি, বিয়ের আগে এত ঘুরেছি যে এখন আর ইচ্ছে করে না। আমরা ভাইবোনে বেশ থাকব, তুমিই ঘুরে এসো।

সাবিত্রী সাতাশ বছর বিবাহিত জীবনে স্বামীর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর-বেলুড় মঠ বাদ দিয়ে শুধু দার্জিলিং আর কাশী দেখেছেন, কিন্তু এই ক'বছরের মধ্যে প্রবীরবাবুর সঙ্গে ছোট বড় অনেক জায়গা ঘুরেছেন। তাই তো উনি মাঝে মাঝেই ঠাট্টা করে বলেন, বুঝলে সুমিত্রা, তোমার দাদার হাতে না পড়লে আমার কিছুই দেখা হতো না।

মিঃ সোম বলেন, হিন্দুদের সবচাইতে পবিত্র তীর্থস্থান আর কুইন অব হিল স্টেশনস দেখবার পর এ দেশে আর কি দেখাব ?

সাবিত্রী বলেন, এ ছাড়া আর তো কোথাও বেড়াবার জায়গা নেই।

সুমিত্রা বলে, দাদার সঙ্গে বিয়ে না হলে তুমি তোমার প্রবীর ঠাকুরপোকে পেতে কোথায় ?

সাবিত্রী সঙ্গে সঙ্গে বলেন, তোমার দাদার সঙ্গে বিয়ে না হলে তো আমি নিজেই ম্যারেজ অফিসার হতাম।

ওর কথায় সবাই হো হো করে হেসে ওঠেন।

প্রবীরবাবু অল্প কথার মানুষ। এতক্ষণ ওদের সবার কথা শোনার পর বললেন, বৌদি, এভাবে দাদার পিছনে লাগলে আমরা দাদার আবার বিয়ে দেব।

মিঃ সোম হাসতে হাসতে বললেন, আমি রাজী।

সাবিত্রী বললেন, তুমি রাজী হলেও তোমার মত টেকোকে কোন মেয়ে বিয়ে করবে না।

ওর কথায় আবার সবাই হাসেন।

সুমিত্রা বলে, দাদার এমন কিছু টাক পড়েনি যে······

মিঃ সোম সঙ্গে সঙ্গে একটা হাত মাথায় দিয়ে বলেন, সত্যি, আমার এমন কিছু টাক পড়ে নি যে কোন মেয়ে···

সাবিত্রী চুপ করে থাকতে পারেন না। বলেন, না, না, তোমাকে দেখে মধুবালা-মীনাকুমারী হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

এর উপর যেদিন নন্দিতা, সুবীর আর ঐ ছোট গুণ্ডা তুতুল আসে সেদিন এ বাড়ী আনন্দে ফেটে পড়ে।

তুতুলের জন্য নন্দিতা বা সুবীরকে কলিংবেল বাজাতে হয় না। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই তুতুল চিৎকার করে, নতুন দাদু, নতুন দিদি, দরজা খোলো। আমি এসেছি। নতুন দাদু······

সাবিত্রী আর সুমিত্রা দরজা খুলতেই তুতুল এক গাল হাসি হেসে সুমিত্রাকে বলে, তুমিও এখানে ? ছোট দাদু তো আজ দুপুরে আমাদের বাড়ী এসেছিল।

সুমিত্রা প্রায় লাফ দিয়ে ওকে কোলে তুলে নিয়ে বলে, তোমার ছোট দাদুর সঙ্গে আমার আড়ি হয়ে গেছে।

তুতুল দুহাত দিয়ে সুমিত্রার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, কেন ? ছোট দাদু বুঝি তোমাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যায় নি ?

না।

ছোট দাদু তো আমাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবে। সেদিন তুমিও যেও।

ঘরে ঢুকে তুতুলকে কোলে বসিয়ে সুমিত্রা বলে, ছোট দাদু যদি আমাকে বকে ?

না, না, ছোট দাদু বকবে না। ছোট দাদুর সঙ্গে গেলে তোমাকে আইসক্রীম খাওয়াবে। তুমি আইসক্রীম ভালবাসো ?

খুব ভালবাসি ?

এবার তুতুল সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, নতুন দিদি, তুমি আইসক্রীম ভালবাসো ?

সাবিত্রী ঠোঁট উল্টে মাথা নেড়ে বললেন, আমি আইসক্রীমও ভালবাসি না, তোমাকেও ভালবাসি না।

তুতুল ঝাঁপ দিয়ে সাবিত্রীর কোলে গিয়ে বলে, তাহলে তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে সন্দেশ খাওয়াও কেন ?

ঠিক আছে, আমি আর কোনদিন তোমাকে সন্দেশ খাওয়াব না।

কেন খাওয়াবে না ? না খাওয়ালে আমি কাঁদব।

সাবিত্রী ওর মুখের উপর মুখ রেখে বলেন, আমি কি আমার ছোট দাদাকে সন্দেশ না খাইয়ে থাকতে পারি ?

বাইরে থেকে ঘুরে এসে মিঃ সোম এঘরে ঢুকেই বলেন, ছোট দাদা, আমি ট্রামে চড়ে বেড়িয়ে এলাম।

ব্যস। সঙ্গে সঙ্গে তুতুল ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, আমাকেও ট্রামে চড়াতে হবে।

নন্দিতা আর সুবীর ওকে প্রণাম করে, কিন্তু মিঃ সোম তুতুলকে নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে ওদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদও

করারও অবকাশ পান না। ট্রামে চড়তে তুতুলের খুব ভাল লাগে। তাই মিঃ সোম ওকে নিয়ে সত্যি সত্যি ট্রামে চড়তে যান।

মিঃ সোম ছোট মামার বন্ধু বলে নন্দিতার নতুন মামা হয়েছেন, সাবিত্রী নতুন মামী। প্রবীরবাবু আর সুমিত্রাকে দেখতে অত্যন্ত সুন্দর বলে তাঁরা হয়েছেন সুন্দর মামা—সুন্দর মামী। তবে তুতুল বলে ছোট দিদি।

তুতুলকে নিয়ে মিঃ সোম বেরিয়ে যাবার পরই নন্দিতা সুমিত্রাকে বলে, তুমি ছেলেটার স্বভাব এমন করে দিয়েছ যে রোজ রাত্রে আমাকে জ্বালাতন করে মারে।

সুমিত্রা একটু হেসে জিজ্ঞাসা করে, কেন, আমি কী করলাম?

তোমার ওখানে গিয়ে ও তোমার কাছে এত সুন্দর সুন্দর গল্প শোনে যে সব সময় আমাকে বলবে, ছোট দিদির মত গল্প বলো।

সাবিত্রী চা করতে গিয়েছেন। সুবীর পাশের ঘরে বসে বই পড়ছে।

সুমিত্রা বলে, ওকে গল্প শোনাবি।

আমি গল্প জানি নাকি?

বাচ্চাদের গল্প জানতে হয় নাকি?

তুমি সুন্দর মামাকে পাবার সাধনায় পঞ্চাশ বছর বাচ্চাদের পড়িয়েছ বলে তুমি গল্প জানতে পারো কিন্তু আমি পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্রী। গল্প জানব কেমন করে?

সুমিত্রা হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে, তাহলে কি করিস?

সুর করে খবরের কাগজ পড়ে ভোলাবার চেষ্টা করি কিন্তু······

সুমিত্রা ওর কথায় খুব জোরে হাসে। তারপর হাসি থামলে হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে নন্দিতাকে বুকের কাছে টেনে নেয়। নন্দিতার মাথায় হাত দিতে দিতে বলে, একদিন ভগবান আমার সব সুখ-শান্তি একসঙ্গে কেড়ে নিয়েছিলেন কিন্তু তখন ভাবতে পারি নি, এমন করে সব ফিরিয়ে দেবেন।

শুধু তুমি কেন? আমিও কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নি, এত সুখ, এত শান্তি, এত ভালবাসা ···

সাবিত্রী এক প্লেটভর্তি খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, তোমরা যে যাই বলো, সবচাইতে বেশী লাভ হয়েছে আমার। ওরা দুজনেই প্রায় একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, কেন? কেন?

সাবিত্রী খাবার প্লেট নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, আমি তোমাদের মত ম্যারেজও করি নি, ম্যারেজ অফিসারও না। অথচ আমি একটা লক্ষ্মণ দেওর পেলাম, তোমার মত কুৎসিত আর হিংসুটে জা পেলাম, সুন্দর মেয়ে জামাই ছাড়াও তুতুলকে বোনাস পেলাম।

সাবিত্রীর কথায় ওরা হাসে।

সাবিত্রী একটু হেসে বলে, তোমাদের না পেলে কবে আমি ঐ টেকো রমেন সোমকে ডিভোর্স করে······

সুমিত্রা দুম করে ওর পিঠে একটা কিল মারে।

সাবিত্রী তবু দমে যায় না। বলে, হাজার হোক সাবিত্রী। রক্ত-মাংসের মধ্যে পতিভক্তি মিশে আছে। তা নয়ত কবে গণেশ উল্টে দেবানন্দের কাছে ছুটে চলে যেতাম।

ওরা তিনজনেই হাসিতে ফেটে পড়ে।

নীতা চৌধুরী আর কনক ঘোষের বিয়ে হয়ে যাবার পর ওদের অফিসের মিঃ ঘোষাল হাসতে হাসতে মিঃ সোমকে বললেন, আমাদের অফিসে যে কটি ঘোষ ব্যাচেলার ছিল, তাদের সবার বিয়েই আপনি দিলেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। এবার মিঃ ঘোষাল বললেন আরো মজার কথা। প্রত্যেকটি মেয়েই ব্রাহ্মণ।

মিঃ সোম জিজ্ঞাসা করলেন, আমার এখানে যাদের বিয়ে হয়েছে, তারা সবাই ভাল আছেন?

হ্যাঁ, প্রত্যেকটা বিয়েই সাকসেসফুল। এবার মিঃ ঘোষাল একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন, আমাদের অফিসের ছেলেমেয়েরা আমাদের মত বুড়োদের বেশ সম্মান করে। তাই প্রত্যেক বিয়ের আগেই আমরাও একটু দেখাশুনা-খোঁজখবর নিই।

শ্রীধরবাবু বললেন, আমাদের অফিসে আমরাই অনেক নিয়ম-কানুন তৈরী করেছি।······

মিঃ সোম জিজ্ঞাসা করেন, কিসের নিয়মকানুন ?

শ্রীধরবাবু বলেন, আমরা নিয়ম করেছি, আমাদের অফিস-স্টাফের বাড়ীতে অন্নপ্রাশন, পৈতেতে আমরা সবাই ছু-টাকা করে চাঁদা দেব, অফিস-স্টাফের ভাইবোন বা ছেলেদের বিয়েতে পাঁচ টাকা করে চাঁদা দিতে হয়। আর অফিস-স্টাফের বা তাদের মেয়ের বিয়েতে চাঁদা দিই দশ টাকা করে।

মিঃ সোম চুপ করে শোনেন।

এইসব টাকা আমরা নগদ দিই। কোন জিনিসপত্র প্রেজেনটেশন দিই না।

খুব ভাল !

মিঃ ঘোষাল বললেন, সবাই চাঁদা দিলেও সবাই নেমন্তন্ন খেতে যাই না। অন্নপ্রাশন-পৈতে বা ভাইবোনের বিয়েতে পাঁচ থেকে দশ জন আর স্টাফের বিয়েতে কুড়িজন নেমন্তন্ন খেতে যায়।

বেশ ভাল তো।

মিঃ ঘোষাল বললেন, আসল কথা, আমরা সবাই অত্যন্ত মধ্যবিত্ত। একটু হিসেব-টিসেব না করে চললে বাঁচব কি ভাবে ?

অমূল্যবাবু নীতাকে দেখিয়ে বললেন, ওর বাবা পোস্ট অফিসের ক্লার্ক। তিন বোনই বেশ বড় হয়েছে, কিন্তু বিধবা পিসীর পুরো সংসার সামলাতে গিয়ে নীতাদের ছু বোনকে চাকরি করতে হচ্ছে। মিঃ সোমের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললেন, আপনিই বলুন, বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করে কি এসব মেয়েদের বিয়ে দেওয়া সম্ভব ?

মিঃ সোম নীতাকে দেখিয়ে অমূল্যবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই রকমভাবে বিয়ে দিতে ওর বাবা-মা আপত্তি করলেন না ?

মিঃ ঘোষাল বললেন, সামনের ষোলই ওদের আনুষ্ঠানিক বিয়ে হবে। তবে আমরাও কণক নীতার বাবাকে স্পষ্ট বলেছি, এক হাজার টাকার এক পয়সা বেশী খরচ করতে পারবেন না।

মিঃ সোম একটু হেসে বললেন, মেয়ের বিয়ের কথা তো বাদই দিলাম। সমস্ত বাঙ্গালী জামাইষষ্ঠীতে যে টাকা ব্যয় করে, তা দিয়ে বোধহয় প্রত্যেক বছর একটা নতুন ষ্টীল প্ল্যাণ্ট বা একটা শহর তৈরী করা যায়।

ওরা দু-তিনজনে একসঙ্গে বললেন, ঠিক বলেছেন।

হঠাৎ মেয়েটি প্রণাম করতেই মিঃ সোম চমকে উঠলেন। তাকিয়ে দেখলেন, মেয়েটি বেশ ডাগর-ডোগর। বয়স বড়জোর ছাব্বিশ-সাতাশ। মিসমিসে কালো রং কিন্তু মুখশ্রী বেশ সুন্দর। পরনে ছাপা শাড়ী। কানে রূপোর দুল।

বাবুজি, আপনি সাদির লাইসেন দেন ?

ওর বোঝার সুবিধের জন্য মিঃ সোম বললেন, হ্যাঁ, আমি বিয়ের লাইসেন্স দিই।

মেয়েটি বেশ ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করল, বাবুজি, আমাকে সাদির লাইসেন দেবেন ?

নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু তুমি কাকে বিয়ে করবে ?

আমার সাহেবকে।

কে তোমার সাহেব ?

গুলসান সাহেব।

কোন্ গুলসান সাহেব ?

যে গুলসান সাহেবের রাঁচীতে কারখানা আছে, এখানে দপ্তর আছে, বোম্বাইতে দপ্তর আছে···। মেয়েটি পুরো কথা শেষ না

করেন্স মিঃ সোমকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি সাহেবকে চেনেন তো ?

না, আমি চিনি না।

যে গুলসান সাহেব হাওয়াই জাহাজে ঘুরে বেড়ায়, কালো রংয়ের বিরাট মোটর আছে···

না আমি চিনতে পারছি না।

কিন্তু বাবুজি, অমোর সাহেবকে তো কলকাত্তার সবাই চেনে। সবাই সাহেবকে রোজ টেলিফুন করে।

মিঃ সোম এবার ওকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কী ?

আমাকে সবাই সরলা বলে।

তোমার দেশ কোথায় ?

রাঁচীর ওদিকে।

তোমার বাবা-মা ওখানেই থাকেন ?

বাপ আবার সাদি করে কোথায় চলে গেছে। মা তো সিং সাহেবের বাড়ীতে ছিলেন। তারপর আর খবর পাইনি।

মেয়েটার ব্যাপার খুব স্বাভাবিক নয় সন্দেহ করে মিঃ সোম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী বরাবর গুলসান সাহেবের বাড়ীতে কাজ করছ ?

না, না। আগে আমি আরো তিনটে সাহেবের বাংলোয় কাজ করেছি। তারপর গুলসান সাহেব মেমসাহেবকে সাদি করলে···

এইরকমই সন্দেহ করছিলেন মিঃ সোম। তাই বললেন, গুলসান সাহেবের মেমসাহেব কোথায় ?

সরলা সরলভাবেই বললো, মেমসাহেবের তো আবার লেড়কা হয়েছে। তাই তো মেমসাহেব চার মাহিনা দিল্লী আছে।

গুলসান সাহেব তোমাকে সাদি করবেন ?

সরলা হেসে বললো, সাহেব আমাকে খুব প্যার করে।

তাই নাকি ?

সরলা গর্বের হাসি হেসে বললো, সত্যি বাবুজি সাহেব, আমাকে খুব প্যার করে। সাহেব শ'টাকা দিয়ে শাড়ী কিনে দিয়েছে। আমাকে খুব ভাল খানা খাওয়ায়, মোটর চড়ায়। তারপর মুহূর্তের জন্য একটু থেমে বললো, মেমসাহেব না থাকলে আমি তো সাহেবের ঘরে রাত্তিরে থাকি।

মিঃ সোম একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তাহলে তো তোমার সাহেব তোমাকে খুব প্যার করেন।

সরলা মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

কিন্তু সাহেব তোমাকে সাদি করবেন তো?

জরুর করবে। আমার যে বাচ্চা হবে! সাহেবকে তো সাদি করতেই হবে।

তোমার বাচ্চা হবে?

সরলা খুশির হাসি হেসে বললো, হ্যাঁ বাবুজি।

মিঃ সোম চুপ করে মাথা নীচু করে বসে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার সাহেব কোথায়?

সাহেব হাওয়াই জাহাজে চড়ে বোম্বাই গেছে।

কবে ফিরবেন?

সাহেব কালই ফিরবেন।

ঠিক আছে। সাহেবকে নিয়ে এসো। আমি তোমার বিয়ের লাইসেন্স দিয়ে দেব।

আনন্দে খুশিতে হাসতে হাসতে সরলা বেরিয়ে গেল।

মিঃ সোম আপন মনে বললেন, তোমার সাহেবও আসছেন না, আমাকে বিয়ের লাইসেন্সও দিতে হবে না।

সত্যি সরলা আর এলো না।

সরলার কথা প্রায় ভুলতেই বসেছিলেন, এমন সময় সরলা আবার হাজির।

কেমন আছো সরলা?

খুব ভাল আছি বাবুজি।

তোমার গুলসান সাহেবের খবর কী ?

সাহেবও খুব ভাল আছেন ?

তোমার বাচ্চা ভাল আছে ?

আমার বাচ্চা হলো না বাবুজি।

কেন ?

আমাকে সাহেব মস্ত বড় বিলাইতি পাস ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার সাহেব আমাকে কত দাবাই দিলেন, সুই ফোটালেন, পেটে কত কি করলেন, কিন্তু বাচ্চা দেখতে পেলেন না।

মিঃ সোম না হেসে পারেন না। বলেন, তোমার সাহেব তো খুব ভাল মানুষ।

সাহেব তো আমার দেবতা আছে।

মেমসাহেব জানেন সাহেব তোমাকে প্যার করেন ?

সাহেব আমাকে হর মাসে একশো টাকা দেয়। আমি তাই মেম সাহেবকে কিচ্ছু বলি না।

খুব ভাল করো।

যে সাহেব আমাকে এত প্যার করে, এত খুশী রাখে, এত টাকা দেয়, তার কথা আমি জরুর শুনব। বাবুজি, আমরা বেইমানি করি না।

মিঃ সোম একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, না, না, সরলা, কারুর সঙ্গেই বেইমানি করা ভাল নয়।

নেই বাবুজি, আমি কারুর সঙ্গে বেইমানি করি না। সরলা একটু থেমে মিঃ সোমকে জিজ্ঞাসা করল, বাবুজি, আপনি চোপড়া সাহেবকে চেনেন ?

কোন্ চোপড়া সাহেব ?

বালীগঞ্জের চারতলা বাড়ীতে থাকে।······

না, ঠিক চিনতে পারছি না।

এ চোপড়া সাহেবেরও কারখানা আছে, নিজে মোটরগা চালায়······

তুমি বুঝি ওকে চেনো ?

খুব ভাল করে আমি চিনি।

হঠাৎ মিঃ সোমের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, উনিও কী তোমাকে প্যার করেন ?

সরলা সঙ্গে সঙ্গে জিভ কামড়ে বললো, নেই বাবুজি। এই চোপড়া সাহেব আমার সাহেবের দোস্ত আছেন। আমার সাহেব হাওয়াই জাহাজে চড়ে বাইরে গেলেও চোপড়া সাহেব জরুর আসবেন।

তারপর ?

মেমসাহেবের সঙ্গেও চোপড়া সাহেবের খুব দোস্তি।

তাই নাকি ?

চোপড়া সাহেব মেমসাহেবের সঙ্গে দু-তিন ঘণ্টা গল্প করে যাবার সময় আমাকে জরুর বিশ-পঁচিশ রুপেয়া দিয়ে বলবেন কিসীকো মাত বোলনা, হাম আয়ীথী।

তুমি কাউকে বলো নাকি ?

নেই বাবুজি, কাউকে বলি না।

তোমার মেমসাহেব তোমাকে টাকা দেন না ?

সব সময় দেন না, তবে চোপড়া সাহেবের সঙ্গে পিকচার দেখতে গেলে আমাকেও পিকচার দেখার টাকা দেন।

তাহলে তুমি তো ভালই আছো।

সরলা হেসে বললো, বড়া আদমীর কোঠীতে নোকরি করে আরাম আছে।

তোমার নিশ্চয় অনেক টাকা জমেছে ?

সরলা চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, ঐ শালা হরভজন চুরি না করলে আমার অনেক টাকা····· ··

হরভজন আবার কে ?

হেবের ড্রাইভার। সাহেব না থাকলেই ঐ শালা হরভজন রাত্রে আমার ঘরে আসবে।……

মিঃ সোম হেসে ফেলেন।

সরলাও হাসে। বলে, ও শালা আমাকে প্যারও করে, আমার টাকাও চুরি করে।

তুমি বিয়ে করবে না?

দো-এক সাল বাদ সাদি করব।

কাকে বিয়ে করবে?

বোধহয় হরভজনকেই সাদি করব।

সোম সাহেব একটু হেসে বললেন, কিন্তু হরভজন যে তোমার টাকা চুরি করে।

সরলা একটু সলজ্জ হাসি হেসে বললো, বাবুজি, আমার তো টাকার দরকার নেই, কিন্তু ওর টাকার জরুরত আছে।

কেন? হরভজন কী গুলসান সাহেবের কাছ থেকে মাইনে পায় না?

সরলা বেশ চিন্তিত হয়ে বললো, গাঁওতে ওর বিবি-বাচ্চারা আছে আর ওদের অসুখবিসুখ লেগেই আছে।

সোম সাহেব মনে মনে হাসলেও বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, তাই বুঝি ও তোমার টাকা নেয়?

হ্যাঁ, বাবুজি।

আচ্ছা সরলা, হরভজন এমনি বেশ ভাল লোক, তাই না?

হ্যাঁ বাবুজি, হরভজন আচ্ছা আদমী আছে। এবার ও চোখ দুটো বড় বড় করে বললো, ওর মোটর চালান দেখলে আপনার দিলখুশ হয়ে যাবে।

আচ্ছা!

সরলা সহজ সরল আদিবাসী মেয়ে। মানুষকে সে বিশ্বাস করে, ভালবাসে। নগরজীবনের নোংরামী বা কুটিলতাকেও সে সহজভাবে

গ্রহণ করে, মেনে নেয়। শুধু দু'মুঠো অন্ন আর একটু আশ্রয়ের জন্য আজ কোথা থেকে সে কোথায় এসে পৌঁচেছে। তার সারল্যের সুযোগ নিচ্ছে প্রভু ভৃত্য সমানভাবে কিন্তু এরপর ? যেদিন সরলার মধু ফুরিয়ে যাবে ? যখন ওদের নেশা কেটে যাবে ? তখন ?

ভাবতে গিয়েও সোম সাহেবের মাথা ঘুরে যায়।

হঠাৎ সরলা বললো, বাবুজি!

কী ?

এক রোজ হরভজনকে নিয়ে আসব ?

নিশ্চয়ই।

সরলা আরো পাঁচ-দশ মিনিট গল্প করার পর চলে গেল।

মিঃ সোম নিজের মনে মনেই ভাবেন। না ভেবে পারেন না। আমাদের মধ্যে কত গুলসান আর চোপড়া লুকিয়ে রয়েছে, তা ভেবেই উনি চমকে ওঠেন।

সরলা বিয়ে না করলেও সমাজের যে ছবি তার কাছে প্রকাশ করল, তার জন্য তিনি মনে মনে ঐ মেয়েটিকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারেন না।

বাঘ-ভাল্লুক পশু-পক্ষীর মধ্যে ভালবাসার বিশেষ মরশুম আছে। মানুষের ভালবাসার, প্রেম করার কোন মরশুম নেই। তাইতো গ্রীষ্ম-বর্ষা, শরৎ-হেমন্ত, শীত-বসন্তে মানুষের জন্ম হয়। এখন বিয়েও হয়।

ভাদ্দর মাসের প্রথম দিনেই যিনি বিয়ের নোটিশ দিতে এলেন তিনিও এক সাহেব। পাত্রী প্রতিবেশীর আয়া। তবে ইনি গুলসান সাহেবের মত ছোকরাও নন, বিবাহিতও নন। এ সাহেব যৌবনের শুরুতে প্রেম করলেও বিবাহ করতে পারেন না বলে মনের দুঃখে সুদূর ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন থেকে কলকাতা চলে আসেন।

এ অনেক কাল আগেকার কথা। তখন কলকাতায় ঘোড়ার ট্রাম

না‍লেও রাইটার্স বিল্ডিং আর লাট সাহেবের বাড়ীর মাথায় ইউনিয়ন জ্যাক উড়ত। এই ম্যাথুজ সাহেব কয়েক দিনের জন্য কোট্টায়ামের এক পরিচিতি ভদ্রলোকের ভবানীপুরের বাড়ীতে অতিথ্য গ্রহণ করলেন। সে পরিবারের আতিথ্য উপভোগের সম্মান বেশী দিন না পেলেও ঐ ভদ্রলোকের সুপারিশে একটা সত্যিকার সাহেবী কোম্পানীতে একটা চাকরি পেলেন।

বিলিভ মী, মিঃ সোম, আমি ওকে ঠিক আমার ফাদারের মত রেসপেক্ট করতাম। উনি আমাকে বাড়ীতে থাকতে না দিলেও আই এ্যাম ভেরী ভেরী গ্রেটফুল টু হিম।

মিঃ সোম বললেন, যিনি আপনাকে প্রথম আশ্রয় দেন, যিনি চাকরি দেন, তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকাই তো উচিত।

মিঃ সোম আমার বাসায় কার কার ফটো আছে জানেন ?

কার কার ?

নম্বার ওয়ান মাদার মেরী এ্যাণ্ড ফাদার জিসাস, নাম্বার টু আমার বাবা-মার এ্যাণ্ড নাম্বার থ্রী এই ভদ্রলোকের।······

মিঃ সোম অত্যন্ত খুশী হয়ে বললেন, ভেরী গুড।

মিঃ ম্যাথুজ আজ বিয়ে করতে এসে পুরানো দিনের স্মৃতি রোমন্থন না করে পারেন না। বলেন, বিলিভ মী মিঃ সোম, আমি কমলাকে সত্যি দারুণ ভালবাসতাম এ্যাণ্ড পসিবলি আই স্টিল লাভ হার। কিন্তু বিয়ের প্রস্তাব করায় কমলা এ্যাণ্ড হার আংকল আমাকে এমন অপমান করল যে রাগে, দুঃখে, অপমানে আই স্টার্টেড গোয়িং টু প্রসটিটিউটস্।···

আপনি বেশ্যা বাড়ী যেতেন ?

ইয়েস মিঃ সোম। এবার একটু হেসে মিঃ ম্যাথুজ বললেন, ডোণ্ট ফরগেট ব্যর্থ প্রেমিক প্রাণ দিতেও পারে, নিতেও পারে। সুতরাং বেশ্যাবাড়ী যাওয়া তো কিছুই না।

একটু চুপ করে থাকার পর মিঃ সোম জিজ্ঞাসা করলেন, কমলার সঙ্গে কোথায় আপনার ভাব হয় ?

ম্যাথুজ সাহেব একটু হেসে বললেন, শুনবেন কমলার কথা ?

মানুষের সুখ-দুঃখের কাহিনী শুনতে আমার ভালই লাগে।

ভেরী গুড! তাহলে শুনুন।

সে অনেক বছর আগেকার কথা।

ফাদার চেরিয়ান চার্চের সামনেই পায়চারী করতে করতে বাইবেল পড়ছিলেন। ছেলেটি দৌড়ে এসে ওর সামনে থমকে দাঁড়াতেই ফাদার চেরিয়ান একটু হেসে বললেন, ইয়েস মাই সন।

ফাদার, আমি পাস করেছি।

বৃদ্ধ ফাদার চেরিয়ান সঙ্গে সঙ্গে দুটো চোখ বন্ধ করে আপন মনে বললেন, ও লর্ড! তুমি সত্যি করুণার সাগর।

পরম পিতা যীশুকে ধন্যবাদ জানাবার কারণ আছে ফাদার চেরিয়ানের। পরমপিতার অপার করুণা না হলে পিতৃ-মাতৃহীন শিশুটিকে উনি কিছুতেই বাঁচাতে পারতেন না। সেদিনের সেই শিশুটি আজ বি. এ. পাস করল।

ভাবতে গিয়েই ফাদার চেরিয়ানের চোখে জল আসে। ··আই এ্যাম রিয়েলি সো হ্যাপি মাই সন ··

ছেলেটির চোখেও জল। সে কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, আমি তা জানি ফাদার।

ফাদার চেরিয়ানও নিজেকে সামলে নেন। ছেলেটির কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, মাই সন, গো ইনসাইড। প্রার্থনা করে এসো।

কয়েক দিন পরে ফাদার চেরিয়ান ওকে জিজ্ঞাসা করলেন, এবার কী করবে ?

ভাবছি, চাকরি-বাকরি করব।

কোথায় ?

আমাদের এই পালঘাটে কি আর চাকরি পাব; তাই ভাবছি, কোন বড় শহরে চলে যাব।

কোন্ বড় শহরের কথা ভাবছ? মাদ্রাজ না বোম্বে? নাকি কলকাতা?

মনে হয় বোম্বে যাওয়াই ভাল।

ইয়েস ইউ ক্যান গো দেয়ার। চেষ্টা করলে অত বড় শহরে নিশ্চয়ই কোন ভাল কাজ পেয়ে যাবে। তাছাড়া ঈশ্বরকে মনে রেখো; তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

মিঃ ম্যাথুজ একটু হেসে বললেন, বি. এ. পাস করার এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি বোম্বে হাজির; আর বোম্বে আসার তিন দিনের মধ্যেই একটা চাকরিও জুটে গেল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। তবে দু'মাস পরেই ঐ চাকরি ছেড়ে দিলাম।···

কেন?

নেভি'র ষ্টোরে একটা চাকরি পেলাম।

কোথায় থাকতেন?

থাকতাম চেম্বুরের এক মেসে।

তারপর কি হলো বলুন।

দু'বছর বোম্বে ছেড়ে কোথাও যাই নি। দু'বছর পর হঠাৎ খবর পেলাম, ফাদার চেরিয়ান খুব অসুস্থ। তাই তাঁকে দেখার জন্য ছুটেগেলাম পালঘাট। মিঃ ম্যাথুজ খুব জোরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, আমি পৌঁছবার পরদিন ভোরবেলায় ফাদার চেরিয়ান মারা গেলেন।

মারা গেলেন?

হ্যাঁ।

ওঁর কত বয়স হয়েছিল?

সেভেনটি ফোর। মিঃ ম্যাথুজ একটু থেমে বললেন, উনি আমার বাব-মা শিক্ষক ভাই-বন্ধু সবকিছু ছিলেন। তাই সাত দিনের ছুটি নিয়ে গেলেও পুরো একমাস পড়ে রইলাম ঐ পালঘাটে।

তারপর ?

ফাদার চেরিয়ানের ছোটভাই ব্যাঙ্গালোরে থাকতেন। উনি আমাকে জোর করে ব্যাঙ্গালোর নিয়ে গেলেন এবং সেখানেও তু'সপ্তাহ কাটিয়ে দিলাম।

তারপর বোম্বে ফিরলেন ?

হ্যাঁ। মিঃ ম্যাথুজ একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, আমার ঐ তুঃখের দিনেই কমলার দেখা পেলাম।

কোথায় ?

ট্রেনেই।

কী ভাবে আলাপ হলো ?

ট্রেনে প্রায় সামনা-সামনি বসে থাকলেও আলাপ হয়নি। আলাপ হলো, দিন তুয়েক পরে চেম্বুর স্টেশনে।

তু'জনেই তু'জনকে দেখে অবাক। তুজনেই একটু হাসেন। তারপর ম্যাথুজই তু'এক পা এগিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি এখানে ?

আমি তো এই চেম্বুরেই থাকি।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

আমিও তো চেম্বুরে থাকি।

সে কি ?

সেদিন আর বিশেষ কথা হল না। ট্রেন আসতেই তু'জন হারিয়ে যায়।

ক'দিন আবার এই চেম্বুর ষ্টেশনেই দেখা। আবার কিছু কথা। তারপর পর পর ক'দিন দেখা। আরো কিছু কথা কখনও কখনও একই ট্রেনে পাশাপাশি বসে যাতায়াত। মাঝে মাঝে দেখা হয় না।

এইভাবেই মাস ছয়েক কেটে গেল।

তারপর একদিন ম্যাথুজ কমলার অফিসে ফোন করল, ঠিক

বুঝতে পারছি না আপনাকে একটা অনুরোধ করা উচিত হবে কিনা।

এত দ্বিধা করছেন কেন। কি বলতে চান বলে ফেলুন।

ম্যাথুজ তবু একটু দ্বিধা করে। আস্তে আস্তে বলে, এ সংসারে আমার কোন আপনজন নেই।···

কমলা বিশ্বাস করতে পারে না। বলে, তাই কখনো সম্ভব।

সত্যি আমার কোন আপনজন নেই।

আপনার বাবা-মা নেই।

না, ওরা আমার ছোটবেলায় মারা যান।

ভাইবোন।

না, আমার কোন ভাইবোনও নেই।

মামা-কাকারাও নেই।

থাকলেও আমি জানি না।

কমলা সঙ্গে সঙ্গে কোন কথা বলতে পারে না। একটু ভেবে জানতে চায়, আপনি কার কাছে থেকে লেখাপড়া করলেন।

আমাদের পালঘাটের ফাদার চেরিয়ানই আমাকে মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন।

তাহলে উনিই তো আপনার আপনজন।

উনিও মারা গেছেন। ম্যাথুজ একটু থেমে বলে, ওর মৃত্যুর পর যখন আমি ফিরছিলাম তখনই তো ট্রেনে আপনাকে প্রথম দেখি।

তাই নাকি।

হ্যাঁ।

কিন্তু আমাকে তো তা কোনদিন বলেন নি।

আমার দুঃখের কথা বলে অন্যের মন ভারাক্রান্ত করার ইচ্ছা আমার হয় না।

কমলা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সত্যি, আপনি অদ্ভুত মানুষ। এবার বলুন কি অনুরোধ করতে চান?

আগামী শুক্রবার আমার জন্মদিন। তাই ভাবছিলাম আপনি যদি সেদিন আমার সঙ্গে ডিনার খান, তাহলে....

আপনার জন্মদিনে আপনি কেন খাওয়াবেন। আমিই আপনাকে খাওয়াব।

না, না, আমিই....

কেন ? আমি খাওয়ালে কী আপনি খাবেন না।

না, না, তা বলছি না।....

কাল অফিস ছুটির পর আপনি আমার অফিসে চলে আসবেন। তারপর একসঙ্গে বেরুব।

মিঃ ম্যাথুজ একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, জানেন মিঃ সোম, কমলা আমার জন্মদিনে কি করেছিল।

কী ?

সেদিন সকালে একই ট্রেনে দুজনে বোম্বে এলাম। নিজেও অফিস গেল না, আমাকেও যেতে দিল না। দুজনে মিলে খুব ঘুরে বেড়ালাম, সিনেমা দেখলাম। তারপর ডিনার খেয়ে বেশ রাত্রে চেম্বুর ফিরে গেলাম।

মিঃ সোম শুধু একটু হাসেন।

আরো মজার কথা শুনবেন ?

কী ?

সেদিন কমলা আমাকে একটা পয়সা খরচ করতে দিল না। উপরন্তু আমাকে একটা শেফার্স ফাউন্টেন পেন প্রেজেন্ট করেছিল।

মিঃ সোম এবারও কোন প্রশ্ন করেন না। শুধু ম্যাথুজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ম্যাথুজ সাহেব আপন মনে বলে যান, একদিন নয়, দু'দিন নয়, দীর্ঘ পাঁচটি বছর কমলা আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ভরে রেখেছিল। তারপর হঠাৎ একদিন মনে হলো, আমাদের দুজনের

সম্পর্ক এত গভীর, এত নিবীড় হয়ে উঠেছে যে এবার আমাদের বিয়ে না হলে·হয়ত কোন কেলেঙ্কারী ঘটে যাবে।

এতক্ষণ পরে মিঃ সোম প্রশ্ন করেন, এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও আপনাদের বিয়ে হলো না?

মিঃ ম্যাথুজ হেসে বললেন, আমি যে ক্রিশ্চিয়ান আর কমলা যে হিন্দু!

কি দুঃখের কথা।

মিঃ ম্যাথুজ আবার একটু হাসেন। বলেন, না, না, মিঃ সোম, একটুও দুঃখেব কথা নয়। এ সংসাবের অধিকাংশ মানুষই লুকিয়ে-চুরিয়ে সব কিছু করতে রাজী কিন্তু প্রকাশ্যে অনেক কিছুই করবে না।

যাকগে ওসব কথা ভুলে যান।

না, না, মিঃ সোম, এসব কথা কিছুতেই ভুলে যাওয়া যায় না।

কিন্তু তাই বলে আপনি বেশ্যাবাড়ী যেতেন কেন?

রাগে, দুঃখে, হতাশায়।

নিয়মিত যেতেন?

হ্যাঁ।

তারপর?

তারপর একদিন পকেটে বিশেষ টাকাকড়ি ছিল না কিন্তু তবু সেই পুরানো বেশ্যার কাছে গেলাম এ্যাণ্ড সী ইনসালটেড মী লাইক এনিথিং।

মিঃ সোম হাসেন।

ঐ বেশ্যার কাছে অপমানিত হয়ে মনে মনে ঠিক করলাম, আর কোনদিন কোন মেয়েকে স্পর্শ করব না। এইটুকু বলেই মিঃ ম্যাথুজ টাই-এব নট ঢিলা করলেন, পট পট করে জামার বোতাম খুললেন। তারপর গলায় ঝোলান ক্রশ বের করে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে বললেন, ফাদার জিসাসের নামে শপথ করে বলছি, তারপর আর কোন মেয়ের কাছে যাই নি।

পাত্রী এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। এবার সে মিঃ সোমের দিকে তাকিয়ে বললো, ইয়েস স্যার, হি ইজ ভেরী অনেস্ট।

এবার মিঃ সোম হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন ?

মিঃ ম্যাথুজ এবার এক গাল হাসি হেসে বললেন, ইয়েস। নাউ আই মাস্ট টেল ছ্যাট। এবার উনি আয়াকে দেখিয়ে বললেন, কান্তম্মার দেশ মাদ্রাজ। চোদ্দ বছর বয়সে বিয়ে হয়। স্বামী বছর খানেক স্ফূর্তি করেই পালিয়ে যায়। তার দু-তিন বছর পর ওদের দেশের একটা ছোঁড়া কলকাতা থেকে মাদ্রাজ গেল। কান্তম্মাকে দেখে তার খুব ভাল লাগল। ও বিয়ে করবে বলে ওকে কলকাতা নিয়ে এলো।

বিয়ে করল ?

মিঃ ম্যাথুজ মাথা নেড়ে বললেন, এমনিই যদি স্ফূর্তি করা যায় তহেলে বিয়ে করবে কেন ? সে হারামজাদা বছর খানেক মধু খাবার পর কোথায় উড়ে গেল।

তারপর ?

তারপর থেকেই ও আমার পাশের ফ্ল্যাটে আয়ার কাজ করছে। যতদিন ও বাড়ীর বুড়ো-বুড়ী বেঁচে ছিল ততদিন কান্তম্মা ভালই ছিল কিন্তু বুড়ো-বুড়ীর ছোট দুটো ছেলে বড় বদ। ও বাড়ীতে কান্তম্মার কাজ করা সত্যি নিরাপদ নয়……

তাই আপনি ওকে বিয়ে করছেন ?

না, না, শুধু এজন্য ওকে বিয়ে করছি না। আজ যে বারো বছর কান্তম্মা আমার পাশের ফ্ল্যাটে কাজ করছে, তার মধ্যে আমার তিন-চারবার মারাত্মক অসুখ হয়েছে এবং এই মেয়েটার জন্যই আমি বেঁচে উঠেছি।

মিঃ সোম মুগ্ধ হয়ে ওদের দুজনকে দেখেন।

এবার মিঃ ম্যাথুজ বলেন, আই এ্যাম ফর্টিনাইন এ্যাণ্ড শী ইজ থার্টিফোর। একবার ভেবেছিলাম, ওকে বোনের মত আমার

কাছেই রাখব কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, তাতে তুজনেরই বদনাম।······

ঠিক বলেছেন।·····

আই ডোণ্ট কেয়ার ফর মাই রেপুটেশন কিন্তু মেয়েদের মর্যাদা নিয়ে ছেলেখেলা করা ঠিক নয় বলেই ঠিক করলাম, কান্তাম্মাকে বিয়ে করব এবং আমি গ্রেটফুল যে কান্তাম্মা আমার কথা মেনে নিল।

মিঃ সোম ওদের তুজনকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, আচ্ছা মিঃ ম্যাথুজ, আপনি এত ধার্মিক হয়েও চার্চে গিয়ে বিয়ে করলেন না কেন ?

আই কাণ্ট। আমি খ্রীষ্টান কিন্তু কান্তাম্মা তো হিন্দু। এবার উনি একটু হেসে বললেন, আমি ওকে বিয়ে করছি বলেই ওর ধর্ম পরিবর্তন করাবো কেন ?

ঠিক।

ওরা বিয়ের নোটিশ দিয়ে চলে যাবার সময় মিঃ সোম ম্যাথুজকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আপনাকে দেখে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব ভাল লাগল। ভগবান নিশ্চয়ই আপনাদের সুখী করবেন।

মিঃ ম্যাথুজ ওর একটা হাত নিয়ে কান্তাম্মার মাথায় দিয়ে বললেন, মিঃ সোম, আপনি এই মেয়েটাকে আশীর্বাদ করুন আর আপনাদের গডেস মা কালীকে বলুন, এই মেয়েটাকে যেন আমি সুখী করতে পারি।

আপনি নিশ্চয়ই ওকে সুখী করতে পারবেন।

বিয়ের দিন ওদের তুজনকে দেখেই মিঃ সোম অবাক। মিঃ ম্যাথুজ নতুন স্যুট পরেছেন। সঙ্গে নতুন জামা, নতুন টাই, নতুন জুতো। দেখে মনেই হয় না, ওর বয়স উনপঞ্চাশ, মনে হয় বড় জোর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। নতুন সিল্কের শাড়ী-ব্লাউজ পরে কান্তাম্মাকেও অপূর্ব লাগছে। তুজনেরই মুখে হাসি, চোখে বিদ্যুৎ, হাতে ফুল।

যে তিনজন সাক্ষী দিতে এসেছেন, তারাও যেন বিয়ে বাড়ীর নেমন্তন্ন খেতে এসেছেন। তিনজনেই বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ম্যাথুজ সাহেবের অফিসেই কাজ করেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ হলো। মিঃ সোম টেবিলের ড্রয়ার থেকে ছোট্ট দুটো প্যাকেট বের করে ম্যাথুজ আর কান্তাম্মার হাতে দিয়ে বললেন, মাই টোকন প্রেজেনটেশন···

মিঃ ম্যাথুজ মাথা নত করে উপহার গ্রহণ করেই আঙ্গুল দিয়ে বুকের উপর ক্রশ এঁকে বললেন, আমরা সত্যি সুখী হবো। তা না হলে ঈশ্বর আমাদের আপনার কাছে পাঠাতেন না।

মিঃ সোম একটু হাসেন।

এবার ম্যাথুজ জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি সবাইকেই প্রেজেনটেশন দেন?

না। আপনাদেরই প্রথম দিলাম।

মিঃ ম্যাথুজ মিঃ সোমকে জড়িয়ে ধরে বললেন, উই আর সো লাকী, উই আর সো হ্যাপি ·····

মিঃ সোম হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, এবার কী প্ল্যান।

মিঃ ম্যাথুজ একটু আনমনা হয়ে বললেন, আমি সারা জীবন চাকরি করেছি, বিয়ার খেয়েছি আর তাস খেলেছি। আর এই মেয়েটা তো জীবনে একদিনও প্রাণভরে হাসতে পারে নি। তাই ঠিক করেছি, এবার আমরা একটু আনন্দ করব। এবার উনি একটু হেসে বললেন, দার্জিলিং-কালিম্পং-কার্শিয়াং-এ একমাস ধরে হনিমুন করব।

নিশ্চয়ই আনন্দ করবেন।

এবার মিঃ ম্যাথুজ দু হাত উঁচু করে বললেন, জেন্টলমেন, নাউ উই ডিসক্লোজ আওয়ার ফাইন্যাল প্ল্যান। আমরা দুজনে আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এই হনিমুনের সময়ই কান্তাম্মা উইল বী প্রেগন্যান্ট।

আরো কত ছেলেমেয়ে, মেয়ে-পুরুষ এলেন, গেলেন কিন্তু মিঃ ম্যাথুজ আর কান্তাম্মা মিঃ সোমের মনে যে আবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, তা মুছে গেল না।

পচা ভাদ্দর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আকাশ-বাতাস মাঝে মাঝেই জানিয়ে দিচ্ছে, শরৎ এসে গেছে।

শেষ রাত্রির থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কিন্তু ভোর থেকেই মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বাড়ীতে মিঃ সোম একা। সাবিত্রী কদিন আগে ওর মাসতুতো বোনের বিয়েতে গেছেন, এখনও ফেরেন নি।

হঠাৎ এই বৃষ্টির মধ্যে কলিং বেল বাজাতেই মিঃ সোম যেন চমকে উঠলেন। আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখলেন, দুটি ছেলেমেয়ে। উনি অবাক হয়ে বললেন, এই বৃষ্টির মধ্যে এসেছেন?

ছেলেমেয়ে দুটি কোন জবাব না দিয়ে ওর পিছন পিছন ঘরে এসেই মিঃ সোমের পায় হাত দিয়ে প্রণাম করল।

মিঃ সোম একটু অবাক হয়ে বললেন, প্রণাম করছেন কেন?

ছেলেটি ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো, কলকাতায় এসেছি শুধু আপনাকে প্রণাম করতে।

এবার মেয়েটি বললো, সেদিন আপনি সাহায্য না করলে তো আমাদের আত্মহত্যা করতে হতো।

মিঃ সোম ওদের দুজনকে একবার ভাল করে দেখেও ঠিক চিনতে পারলেন না। বললেন, আমি আপনাদের কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

ওরা দুজনে প্রায় এক সঙ্গে বললো, আমাদের আপনি বলছেন কেন?

আচ্ছা, আচ্ছা, তোমাদের নাম কি?

ছেলেটি বললো, আমার নাম প্রবাল—

মিঃ সোম চমকে উঠে বললেন, তুমি প্রবাল?

হ্যাঁ।

বছর চার-পাঁচ আগে এই রকমই বর্ষার মধ্যে—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন।

এবার মেয়েটি একটু হেসে বললো, আমি বাণী।

মিঃ সোম এবার একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার দাদুভাই ভাল আছে?

প্রবাল বললো, হ্যাঁ। সে এখন স্কুলে পড়ছে।

এত বড় হয়ে গেল?

বাণী বললো, এত বৃষ্টি হচ্ছে বলে ওকে আনতে পারলাম না। কাল-পরশু ওকে দেখিয়ে নিয়ে যাব।

এতক্ষণ পরে মিঃ সোমের খেয়াল হলো, ওরা সবাই দাঁড়িয়ে। বললেন, বসো, বসো।

সবাই বসলেন।

বসার পরই প্রবাল বললো, আপনার একটা কথা আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না।

মিঃ সোম একটু বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন কথা?

বাণী বললো, আপনি আমাদের বলেছিলেন, আমি চাই না কোন শিশু কলংকের বোঝা মাথায় নিয়ে এই পৃথিবীতে আসুক।

মিঃ সোম একটু হেসে বললেন, বলেছিলাম নাকি?

প্রবাল বললো, হ্যাঁ।

মিঃ সোম আপন মনে ভাবতে ভাবতে কোথায় যেন তলিয়ে যান। আস্তে আস্তে সেই হারিয়ে যাওয়া পুরানো স্মৃতি ওর মনে পড়ে।···

সেদিনও ঠিক এই রকমই বৃষ্টি হচ্ছিল। প্রবাল আর বাণী পাগলের মত কাঁদতে কাঁদতে ওর পা জড়িলে ধরল।

আপনি আমাদের বাঁচান, তা নইলে আমাদের আত্মহত্যা করতে হবে।

কেন? কী হয়েছে তোমাদের?

প্রবাল বললো, আমরা দুজনেই দারুণ অন্যায় করেছি।···

বাণী আর চেপে রাখতে পারল না। বললো, আমি প্রেগন্যাণ্ট।

মিঃ সোম চমকে উঠলেন, প্রেগন্যাণ্ট।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি প্রেগন্যাণ্ট। আপনাকে এখুনি আমাদের বিয়ে দিতে হবে!···

কিন্তু···

না, না, কোন কিন্তু শুনব না। আপনি বিয়ে না দিলে আজ রাত্রেই আমাদের ··

চুপ করো, চুপ করো। ওসব কথা বলো না।

ওরা দুজনে আরো অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করল, আরো অনেকক্ষণ অনুনয়-বিনয় করল।

খুব জোরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মিঃ সোম বললেন, আমি শুনেছি কোন কোন ম্যারেজ অফিসার একটু বেশী টাকা পেলেই···

বাণী কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ গলার মোটা হার খুলে ওর সামনে রেখে বললো, আপনি যা চান··

মিঃ সোম একটু হেসে বললেন, আমি বেআইনী কাজ করি না কিন্তু···

ওরা দুজনে প্রায় একসঙ্গে বললো, কিন্তু কী?

আমি চাই না, কোন শিশু কলংকের বোঝা মাথায় এই পৃথিবীতে আসুক!···

প্রবাল বললো, আপনার কাছ থেকে সার্টিফিকেট পাবার পরই আমরা কলকাতা থেকে সরে পড়লাম।

মিঃ সোম জিজ্ঞাসা করলেন, তখন কী তুমি বি. এ. পাস ছিলে?

বি-কম পার্ট টু পরীক্ষা দিয়েছিলাম। তবে জব্বলপুরে যাবার মাসখানেক পর খবর পেলাম, পাস করেছি।

বাণী বললো, আপনার আশীর্বাদে আমিও সেবার পাস করি।

খুব ভালো।

প্রবাল বললো, প্রথমে ছোট মামার ওখানেই উঠেছিলাম কিন্তু মাস দেড়েকের বেশী থাকতে পারলাম না; ক'টা মাস কিভাবে যে আমরা বেঁচেছিলাম, তা শুধু ভগবানই জানেন।

মিঃ সোম জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর ?

বাণী হেসে বললো, যে রাত্রে আমার ছেলে হলো তার পরদিনই ও সাড়ে চারশ টাকা মাইনের চাকরি পেল।

খুব ভাল।

প্রবাল একটু হেসে বললো, একদিন যে সন্তানকে অভিশাপ বলে মনে হয়েছিল, সেই ছেলের কল্যাণেই আমরা বেঁচে গেলাম। তাইতো আমরা ছেলের নাম রেখেছি সৌভাগ্য।

মিঃ সোম একটু হেসে বললেন, নাইট ইজ দ্য ডার্কেস্ট বিফোর ডন।

প্রবাল বললো, ঠিক বলেছেন। কলকাতা থেকে রওনা হবার সময় আমার দুই বন্ধু আমাদের রেলের টিকিট কেটে দেয়। বাণীর এক বন্ধু ওর হাতে তিরিশটা টাকা গুঁজে দেয়। এ ছাড়া আমাদের দু'জনের কাছে ঠিক নব্বই টাকা ছিল।

বাণী বললো, আমরা সারা রাস্তা শুধু শুকনো পাউরুটি আর চা খেয়েছি।

প্রবাল বললো, মাস দেড়েক ছোট মামার ওখানে কি অপমান সহ্য করেছি, তা ভাবলেও চোখে জল আসে। তারপর মামী একদিন সোজাসুজি চলে যেতে বললেন।

মিঃ সোম উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্ন করেন, তখনও তোমার কোন চাকরি-বাকরি হয় নি ?

না।

টাকাকড়িও নিশ্চয়ই ফুরিয়ে গিয়েছিল ?

প্রবাল একটু হেসে বললো, মাত্র আঠারো টাকা সম্বল করে ছোট মামার বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম।

তারপর কোথায় গেলে ?

একটা ধর্মশালায় গেলাম। ..

নিজেরাই রান্না করতে ?

বাণী হেসে বললো, বাসন-কোসন তো কিছুই ছিল না। রান্না করব কিভাবে ?

প্রবাল সঙ্গে সঙ্গে বললো, তাছাড়া পয়সাকড়িও তো ছিল না।

তাহলে কি করতে ?

প্রবাল একটু হেসে বললো, এক শিখ গুরুদ্বারে গিয়ে খেতাম।

রোজ ?

হ্যাঁ, রোজ তুবেলা।

তারপর ?

দিন দশ-বারো পরে ঐ গুরুদ্বারের এক বৃদ্ধ শিখ আমাদের বললেন—

আচ্ছা বেটা, তোমরা বাঙ্গালী, তাই না ?

প্রবাল জবাব দেয়, হ্যাঁ।

তোমাদের নতুন সাধী হয়েছে ?

হ্যাঁ।

বাড়ী কোথায় ? কলকাত্তা ?

হ্যাঁ।

হঠাৎ জব্বলপুর চলে এলে কেন ?

প্রবাল সত্যি কথাই বললো, আমাদের বিয়েতে আমাদের বাড়ীর মত ছিল না। তাই...

বুঝেছি, বুঝেছি। বৃদ্ধ একটু থেমে প্রশ্ন করেন, তোমরা নিশ্চয়ই পড়ালিখা জানো ?

হ্যাঁ, তুজনেই গ্র্যাজুয়েট।

বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা। বৃদ্ধ শিখ আবার কি ভাবেন। তারপর জানতে চান, তোমরা কোথায় থাকো ?

একটা ধর্মশালায়।

দুটো ছেলেমেয়েকে আংরেজি পড়াবে ?

নিশ্চয়ই পড়াব।

ওরা তোমাদের থাকার ঘর আর কিছু টাকা দেবে।

তাহলে তো খুব ভাল হয়।

প্রবাল হেসে বললো, সেদিন—বিকেলেই উনি আমাদের সর্দার গুরদীপ সিং'এর বাড়ী নিয়ে গেলেন আর ওদের বললেন, এরা তোমাদের বেটা-বহুর মতই থাকবে।

মিঃ সোম শুনেও খুশি হন।

সত্যি আমরা ও বাড়ীর ছেলে পুত্রবধূ হয়ে গেছি।

ওখানে কতদিন ছিলে ?

বাণী বললো, এখনও তো ওদের কাছেই থাকি। ওরা কিছুতেই বাসা ভাড়া নিতে দেন না।

প্রবাল বললো, চাকরি পাবার আগে পর্যন্ত ওরাই আমাদের খাইয়েছেন।

মিঃ সোম প্রশ্ন করেন, ওরা তোমাদের মাইনে দিতেন না ?

হ্যাঁ, একশ' টাকা দিতেন।

বাণী বললো, এই পরিবারের দেখা না পেলে বোধহয় আমরা বাঁচতে পারতাম না। ওদের ওখানে যাবার মাস দুই পরে হঠাৎ একদিন আমার শরীর খুব খারাপ হলো।

মিঃ সোম জানতে চাইলেন, তারপর ?

খুব লজ্জা করলেও মাতাজীকে না বলে পারলাম না। ..

খবরটা শুনেই মাতাজী রেগে লাল, এ খবর এতদিন আমাকে বলোনি কেন ? এ কথা কেউ লুকিয়ে রাখে ?

মাতাজী ডাক্তারকে খবর দিলেন। ডাক্তারবাবু এলেন। বাণীকে দেখেশুনে ওষুধ দিলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, না, চিন্তার কিছু নেই। বাচ্চা ভালই আছে।

প্রবাল একটু হেসে বললো, এই বাচ্চা হওয়ার ব্যাপারে আমাকে কিছু করতে হয় নি। সবকিছু মাতাজী করেছেন।

এবার বাণী মিঃ সোমের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি কিভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন, সেসব কথা মাতাজীকে বলেছি।...

সবকিছু ?

হ্যাঁ। মাতাজীকে আমরা সবকিছু বলেছি।..

ভালই করেছ।

মাতাজী বার বার করে বলেছেন, আপনাকে একবার জব্বলপুর যেতে।

মিঃ সোম একটু হাসেন।

প্রবাল বলে, না, না, হাসির কথা নয়। আপনাকে আসতেই হবে।

আচ্ছা, সে দেখা যাবে।

বাণী বললো, আপনি আমাদের বিয়ে দিয়েছেন আর আপনি আমাদের সংসার দেখতে আসবেন না ?

ঠিক বলেছ। তোমাদের সংসার একবার দেখে আসা উচিত। মিঃ সোম একটু থেমে বলেন, ফিরে যাবার আগে একদিন সৌভাগ্য-বাবুকে দেখিয়ে নিয়ে যেও।

বাণী বললো, নিশ্চয়ই আসব।

দিন আসে, চলে যায়। সবারই জীবনে তাই হয়। মিঃ সোমের জীবনও ব্যতিক্রম নয়।

কেউ কেউ বিয়ের নোটিশ দিতে আসেন, কেউ কেউ আসেন প্রস্তাবিত বিয়ের বিরুদ্ধে আবেদন করতে ; আবার কেউ কেউ আসেন বিয়ে করতে। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের দিন এইভাবেই কাটে।

ব্যতিক্রমও হয়। হঠাৎ প্রবীর বা সুবীর, সুমিত্রা বা নন্দিতা জুটে যায়। আবার এদের সবাইকে ম্লান করে দেয় ঐ একটা ছোট্ট শিশু তুতুল। ম্যাথুজ-কান্তাম্মাও একটা নতুন সুর। সে সুরের রেশ মন থেকে মুছে যায় না।

মাঝে মাঝে মিঃ সোম আনমনা হয়ে বসে থাকেন। মনে মনে ভাবেন, কত শত শত মেয়ে-পুরুষ তার কাছে এসেছেন কিন্তু ক'জন তার মনে রেখাপাত করতে পেরেছেন ? না, বেশী না ; মাত্র ক'জন। হঠাৎ আকাশের দিকে তাকাতেই চমকে ওঠেন। অত বড় আকাশে কত হাজার-হাজার লক্ষ লক্ষ তারা আছে কিন্তু সবাই কী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে ?

না সবাই অনন্য-অনন্যা হতে পারে না।

না হোক অনন্য-অনন্যা ; তবু, মিঃ সোম প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে মনে করার চেষ্টা করেন। শুক্ল ত্রয়োদশী-চতুর্দশীর আবছা চাঁদের আলোয় হঠাৎ অনেকগুলো ছেলেমেয়ে ওর সামনে ভীড় করে। স্পষ্ট চিনতে না পারলেও অপরিচিত মনে হয় না। উনি এক মনে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

তারপর হঠাৎ পুর্ণিমার আলোয় ভরে যায় ওর স্মৃতির অরণ্য। সামনের প্রত্যেকটি মূর্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মিঃ সোম বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেন, ওরা সবাই শুধু পরিচিত নয়, ওরা সবাই ওর আপনজন, একান্ত প্রিয়জন।

ওদের প্রত্যেককে ভাললাগে মিঃ সোমের। ওদের প্রত্যেকের সুখ-দুঃখের আনন্দ-বেদনার অনুভূতিতে ওর মন ভরে যায়। নিজের মনে মনেই ওদের প্রশ্ন করেন, তোমরা সবাই ভাল আছো তো ? তোমরা সবাই সুখী হয়েছে তো ? কি বললে ? দুঃখ-কষ্ট ? ও কিছু

নয়। ও কালবৈশাখী ঝড়ের মত ভয় দেখাবার জন্য হঠাৎ আসে-যায়। তোমরা তো ভালবাসতে জানো; তোমাদের কোন ভয় নেই। ভালবাসার কাছে এ সংসারের সব দুঃখ-কষ্ট হেরে যায়।

মিঃ সোম একলা থাকলেও কখনো নিঃসঙ্গ থাকেন না। কোন না কোন ছেলেমেয়ে, কোন না কোন ঘটনা সব সময় মনে পড়ে। পড়বেই। পুরানো খাতাপত্তর দেখলে আরো কতজনের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে কত বিচিত্র কাহিনী।

পুরাণো দিনের বহু স্মৃতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে হঠাৎ অচিন্ত্য মুখার্জীর কথা মনে হতেই মিঃ সোম অবাক হয়ে যান। বহু বিচিত্র ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়েছেন কিন্তু এমন অভিজ্ঞতা আর হয় নি। বোধহয় হবেও না।

নমস্কার।

নমস্কার।

আমার নাম অচিন্ত্য মুখার্জী। এবার সে মেয়েটিকে দেখিয়ে বললো, এর নাম প্রিয়া ব্যানার্জী।

এরপর অচিন্ত্য পরিচয় করিয়ে দেয় প্রিয়ার বাবা মুরারীবাবুর সঙ্গে।

মিঃ সোম জানতে চান, বলুন, আমি কী করতে পারি?

মুরারীবাবু অত্যন্ত দ্বিধা ও সঙ্কোচের সঙ্গে অচিন্ত্যকে বললেন, যা বলার তুমিই বলো বাবা।

অচিন্ত্য বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করে বললো, আমি একজন কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ার। বরোদায় চাকরি করি। ছুটিতে এসে শুনলাম, আমার বাবা-মা প্রিয়ার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করেছেন।

আচ্ছা?

হ্যাঁ। আশীর্বাদও হয়ে গেছে কিন্তু বাবা-মা আস্তে আস্তে এমন সব দাবি করছেন যা প্রিয়ার বাবার ক্ষমতার বাইরে।

কী আশ্চর্য।

অচিন্ত্য হেসে বললো, ছেলেকে যখন এঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়েছেন, তখন তা সুদে-আসলে তুলে নেবার অধিকার তাদের আছে বলেই আমার বাবা-মা মনে করেন।

এবার মুরারীবাবু মুখ কাচুমাচু করে বললেন, আমি পোর্ট কমিশনারের গরীব কেরানী। যথাসর্বস্ব দিয়ে তিনটি মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছি।....

মিঃ সোম এবার প্রিয়াকে দেখিয়ে প্রশ্ন করেন, প্রিয়াই কী আপনার বড় মেয়ে ?

এ আমার ছোট মেয়ে। বড় দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে।

একে কতদূর পড়িয়েছেন ?

বাংলায় এম. এ. পাস করেছে।

বাঃ।

এ ছাড়া রবিতীর্থে পাঁচ বছর গান শিখেছে। এবার মুরারীবাবুর মলিন মুখ একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলেন, রবিতীর্থের এক অনুষ্ঠানে ওকে দেখে ও গান শুনেই তো অচিন্ত্যর মামা-মামী এই বিয়ের সম্বন্ধ করেন।

তাই নাকি ? খুশির হাসি হেসে মিঃ সোম বলেন।

মুরারীবাবুও হেসে জবাব দেন, হ্যাঁ।

এবার অচিন্ত্য বললো, আনুষ্ঠানিকভাবেই বৈশাখে আমাদের বিয়ে হবে কিন্তু যদি বাবা-মার জন্য কোন গণ্ডগোল দেখা দেয় তাই মামা-মামীর পরামর্শে আপনার কাছে এসেছি।

মিঃ সোম সরাসরি প্রশ্ন করেন, আপনারা কী সিভিল ম্যারেজ করতে চান ?

স্পষ্ট জবাব দেয় অচিন্ত্য, হ্যাঁ। একটুও না থেমে সঙ্গে সঙ্গে বলে, আপনার দেওয়া সার্টিফিকেটটা পকেটে থাকলে বাবা-মাকে স্পষ্ট বলতে পারব....

আজ অনেক দিন পর হঠাৎ অচিন্ত্যর কথা মনে পড়তেই মিঃ সোমের হাসি পায়। ওর দেওয়া একটা সার্টিফিকেটের ভয়ে অচিন্ত্যর বাবা-মা কোন দাবি-দাওয়া না করেই প্রিয়াকে ঘরে এনেছিলেন।

বিয়ের তৃতীয় বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে প্রিয়া মিঃ সোমকে লিখেছিলেন—আজ আপনাকে মনে না করে পারছি না। আপনার কাছে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে বেশ একটু অভিমান, একটু আহত মন নিয়েই আমি নতুন জীবন শুরু করি। আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর ধারণা হয়েছিল, আমি বা আমাদের পরিবারের কেউ কোনক্রমে তাঁদের একমাত্র পুত্রকে প্রভাবিত করেছি। মামা-মামী দুজনেই ওদের অনেক বুঝিয়েছেন কিন্তু তবু ওরা আমাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি।...

বিয়ের সপ্তাহখানেক পরেই অচিন্ত্য বরোদায় ফিরে যায়। প্রিয়া কলকাতায় শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে থেকে যায়। সে সময় শাশুড়ী মাঝে মাঝেই নানা কথার পর জিজ্ঞাসা করতেন, তুমি তো আর এখন পর নও; এখন একটা সত্যি কথা বলবে?

মুরারীবাবু গরীব কেরানী হলেও মেয়েদের সুশিক্ষা দিয়েছিলেন। প্রিয়া কোনদিনই মিথ্যা কথা বলে না। তাই শাশুড়ীর এ ধরনের প্রশ্নে অত্যন্ত দুঃখ পায়, অপমানিত বোধ করে। রাগও হয়। তবু নিজেকে সংযত রেখে বলে, যা ইচ্ছে জিজ্ঞাসা করুন; আমি সব সত্যি বলব।

বিয়ের আগে কি তোমাদের দুজনের অনেকবার দেখাশুনা হয়েছে?

প্রথম দিন বাবার সঙ্গে সোমবাবুর বাড়ীর সামনে পৌঁছে দেখি, আপনার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।....

সে তো জানি।

দ্বিতীয় দিন মামা-মামী আমাদের বাড়ী এসে আমাকে নিয়ে সোমবাবুর ওখানে নিয়ে যান।

এ ছাড়া আর কত দিন দেখা হয়েছে ?

এই দু'বার ছাড়া বিয়ের আগে আর আমাদের দেখা হয় নি।

শাশুড়ী ঠাকরুণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, না হলেই ভাল কিন্তু সবার ধারণা তোমার সঙ্গে মেলামেশা করেই আমার ছেলের মাথা ঘুরে রায়।

প্রিয়া স্তম্ভিত হয় শাশুড়ীর কথা শুনে কিন্তু প্রতিবাদ করে না।

আরো কত অপমান, কত দুঃখ, কত তিক্ত অভিজ্ঞতা সহ্য করতে হয় প্রিয়াকে।

প্রিয়া লিখেছে, তারপর আস্তে আস্তে মেঘ কেটে যায়। এখন শ্বশুর-শাশুড়ী আমাকে যে—কি ভালবাসেন, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আমার শ্বশুর আমার বাবাকে বলেন, বেয়াই মশাই, বহু জন্মের পুণ্যফলের জন্য প্রিয়াকে আমাদের ঘরে আনতে পেরেছি। এ যুগে ওর মত মেয়ে সত্যি দুর্লভ। আমার প্রতি আমার স্বামীর এত বেশী দুর্বলতা যে সে বেশী দিন আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। তাই বাবা-মার কাছে থাকা বিশেষ হয়ে ওঠে না। শাশুড়ী সবই বুঝতে পারেন। তাই উনি নিজে উদ্যোগী হয়ে বাবা-মাকে দু'বার এখানে আনিয়েছেন। আজ আমি সত্যি সুখী। আশা করি আপনাদের শুভেচ্ছায় ও আশীর্বাদে আমাদের আগামী দিনগুলিও আনন্দে ভরে উঠবে।

এমনি আরো কতজনের কথা ভাবতে ভাবতে বিভোর হয়ে যান মিঃ সোম।

সেদিন সাবিত্রীর জন্মদিন। ছোটবেলায় মা আশীর্বাদ দিয়ে মুখে পায়েস দিতেন। বিয়ের পর স্বামীর কাছ থেকে একটা নতুন শাড়ী পান, আর কিছু নয়। এবার সুমিত্রার উৎসাহে বেশ ভাল ভাবেই সাবিত্রীর জন্মদিন পালন করা হচ্ছে। প্রবীরবাবু অফিস যান নি।

সুমিত্রা আগের দিন চলে এলেও উনি সেদিন ভোরেই এসেছেন। সুবীর ও নন্দিতা আর তুতুলকে নিয়ে খুব সকালেই এসেছে।

মিঃ সোম হাসতে হাসতে বললেন, উদ্যোগ-আয়োজন দেখে মনে হচ্ছে, আজ সাবিত্রীর বিয়ে।

সাবিত্রী একটু মুচকি হেসে বললেন, এরা ভালবেসে আমাকে এত সম্মান দিচ্ছে বলে কি তোমার হিংসে হচ্ছে?

প্রবীরবাবু সঙ্গে সঙ্গে ওদের দুজনের মুখে দুটো কড়া পাকের সন্দেশ গুঁজে দিতেই সব থেমে গেল।

সুমিত্রা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, আমার রান্না প্রায় শেষ। দাদা, স্নান করতে যান।

সুমিত্রার পরামর্শ উপেক্ষা করার সাহস মিঃ সোমের নেই; তাই দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনি বাথরুমে ঢুকলেন। তার মিনিট খানেক পরেই কলিংবেল বেজে উঠল।

প্রবীরবাবু দরজা খুলেই দেখলেন, পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি মেয়ে আর তার ছোট্ট বাচ্ছা।

মেয়েটির করুণ, ম্লান মুখেও হঠাৎ একটু হাসির রেখা ফুটে উঠল বললো, প্রবীরদা, তুমি?

প্রবীরবাবু ওর মুখের দিকে একটু ভাল করে তাকিয়েই বললেন, অর্পি, তুই? উনি এক নিঃশ্বাসেই বললেন, তোর বিয়ে হয়েছে, বাচ্চাও হয়েছে?

অর্পিতা খুব জোরে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বললো, আমার আরো অনেক কিছু হয়েছে।

প্রবীরবাবু তাড়াতাড়ি ওর বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, আয়, আয়, ভিতরে আয়।

অর্পিতা ভিতরে আসতেই প্রবীরবাবু সবাইকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর অর্পিতাকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, আমার ছোটবেলার সব চাইতে প্রিয় বন্ধু দেবব্রতের ছোট

বোন। অপি যেদিন হয়, সেদিন আমি আর দেবু সারা রাত হাসপাতালে কাটিয়েছিলাম।

হঠাৎ একটা নতুন আনন্দ, উত্তেজনার ঢেউ বয়ে গেল সারা বাড়ীতে।

একটু পরে প্রবীরকে একটু আলাদা পেয়ে অর্পিতা ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা প্রবীরদা, এটা মিঃ সোমের বাড়ী না?

ওর প্রশ্ন শুনেই প্রবীরবাবু যেন চমকে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কী ওর কাছে এসেছিস?

হ্যাঁ।

কেন?

পরে বলব।

আমি তো ভেবেছিলাম, তুই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিস।

আমি ওর কাছেই এসেছি কিন্তু তোমাকে এতদিন পর দেখে খুব ভাল লাগল।

যাক বৌদির জন্মদিনে এসে ভালই করেছিস।

না প্রবীরদা, আজ আমি না এলেই বোধ হয় ভাল হতো।

তোর কথাবার্তাগুলো কেমন যেন বেসুরো লাগছে।

শুধু কথাবার্তা না, আমার সমস্ত জীবনটাই বেসুরো হয়ে গেছে।

একটু পরেই অর্পিতা চলে যায়।

কয়েক দিন পরে অর্পিতা আবার, এলো। মিঃ সোম আদর করে ওকে আর ওর বাচ্চাকে ঘরে নিয়ে গেলেন।

অর্পিতা চেয়ারে বসেই বলল। দাদা, আজ কিন্তু আমি জরুরী কাজে আপনার কাছে এসেছি।

বলো দিদি, কী কাজ?

আজ থেকে চার-পাঁচ বছর আগে নিখিল ঘোষাল বলে কেউ আপনার এখানে বিয়ে করেছে?

দাঁড়াও, দেখছি।

মিঃ সোম তালা খুলে আলমারী খুলে মোটা খাতা বের করে দেখতে শুরু করলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে খাতার উপর দিয়ে চোখ বুলাতে বুলাতেই উনি জিজ্ঞাসা করলেন, দিদি ইনি তোমার কে হ'ন ?

পরে বলব।

মিঃ সোম আর কোন প্রশ্ন করেন না। আবার মন দিয়ে খাতার পাতায় নানাজনের নাম দেখেন। আরো আধ ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে জিজ্ঞাসা করলেন, দিদি, তিনি অন্য কোন ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে যান নি তো ?

যতদূর জানি তিনি আপনার কাছেই এসেছিলেন।

দশ-পনের মিনিট পরে মিঃ সোম বললেন, হ্যাঁ, দিদি, পেয়েছি।

অর্পিতা প্রায় চিৎকার করে উঠল, পেয়েছেন ?

মিঃ সোম মুখ না তুলেই মাথা নাড়লেন।

উনি তাহলে সত্যি সত্যি বিয়ে করেছেন ?

হ্যাঁ। এবার মিঃ সোম খাতা দেখতে দেখতে বলেন, ঠিক সাড়ে পাঁচ বছর আগে সাতই আগস্ট উনি···

উনি সুপর্ণাকেই বিয়ে করেছিলেন ?

হ্যাঁ।

অর্পিতা আপন মনেই বললেন, চমৎকার।

মিঃ সোম আবার ওকে প্রশ্ন করলেন, দিদি, ইনি তোমার কে ?

ইনি আমার পতিদেবতা।

তোমার স্বামী ?

অর্পিতা একটু হেসে বললো, হ্যাঁ দাদা, এই মহাপুরুষই আমার স্বামী।

ক' বছর তোমার বিয়ে হয়েছে ?

চার বছর।

তুমি ঠিক জানো উনি ডিভোর্স না করেই তোমাকে বিয়ে করেছেন ?

অর্পিতা একটু অদ্ভুতভাবে হেসে বললো, ডিভোর্স! ও ডাইনীর হাত থেকে ওর নিস্তার নেই।

তোমাদের বিয়ে কিভাবে হয়েছে?

সম্বন্ধ করে।

বিয়ের আগে কিচ্ছু জানতে না?

না। অর্পিতা একটু হেসে বললো, এই সৎপাত্রের জন্য আমার বাবাকে সবকিছু বাদ দিয়েও দশ হাজার টাকা নগদ দিতে হয়েছিল।

কি আশ্চর্য।

এইটুকু শুনেই আশ্চর্য হচ্ছেন? তাহলে সবকিছু শুনলে তো আপনি মুর্ছা যাবেন।

সবকিছু মানে?

আমার পতিদেবতা রোজ অফিস থেকে ফেরার সময় মহারানীকে সঙ্গে আনেন। ওরা এসেই বেডরুমে লুটিয়ে পড়েন আর আমাকে ওদের জলখাবার, রাতের খাবার— মানে সবকিছু সে ঘরে পৌঁছে দিতে হয়।··

ঐ ভদ্রমহিলা কী তোমার ওখানেই থাকেন?

রোজ সন্ধ্যের পর দু-চার ঘণ্টা কাটান। কোন কোন দিন থেকেও যান।

মিঃ সোম মুখ নীচু করে থাকেন।

অর্পিতা বলে, আমার পতিদেবতা আমাকে বাইরে বের করে দিয়ে ঐ ডাইনীকে নিয়ে স্ফুর্তি করে।

তুমি আপত্তি করো না?

না।

কেন?

আপত্তি করলে যে শারীরিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়, তা আর—

চুপ করো দিদি।

একটু চুপ করে থেকে, কাঁদতে কাঁদতে অর্পিতা বললো, আপনি শুনলে অবাক হবেন, লেবার পেন উঠলে আমি ঝিকে নিয়ে নিজে হাসপাতালে গেছি। হাসপাতালে থাকার সময় উনি একদিনও আমাকে বা ছেলেটাকে দেখতে আসেন নি।

তোমার শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা এই জানোয়ারটাকে সায়েস্তা করতে পারেন না?

শ্বশুর-শাশুড়ী ভাসুর-ননদ কারুর সঙ্গেই ওর কোন সম্পর্ক নেই।

তোমার বাড়ীর সবাই এসব জানেন?

কিছু কিছু জানেন কিন্তু সব কথা জানাতে পারি না।

কেন?

সব কথা জানলে বাবা আর বাঁচবেন না।

কিন্তু দিদি, তুমি একা একা এ অত্যাচার কতকাল সহ্য করবে?

অর্পিতা মাথা নেড়ে বললো, জানি না।

তুমি ডিভোর্স কর না কেন?

কী লাভ?

মিঃ সোম এতকালের অভিজ্ঞ ম্যারেজ অফিসার হয়েও জবাব দিতে পারেন না।

দাদা, মাসে মাসে কটা টাকা পেলেই কি আমি বাঁচতে পারব? তাও তো স্বেচ্ছায় দেবেন না, জোর করে···

এখন কি উনি স্বেচ্ছায় তোমাদের খেতে পরতে দিচ্ছেন?

তা ঠিক, কিন্তু—

কিন্তু কী?

দাদা, যদি আবার বিয়ে করতে পারতাম তাহলে হয়ত ডিভোর্স করতাম, কিন্তু তা তো পারব না। অর্পিতা একটু থেমে বললো, স্বামীর সোহাগ পাবার লোভ আর আমার নেই।

একটু পরেই ঘুমন্ত শিশুটাকে কোলে নিয়ে অর্পিতা উঠে দাঁড়াল।

একি দিদি, উঠলে কেন? তোমার বৌদিকে আসতে দাও।

না দাদা, আজ উঠি

এখন কোথায় যাবে ? বাড়ী ?

অর্পিতা হেসে উঠল। বললো, হ্যাঁ, আমার স্বামীর বাড়ী যাব।

কেন ? তাড়া আছে ?

হ্যাঁ দাদা, খুব তাড়া আছে।

অর্পিতা বাচ্চাটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে প্রায় ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

মিঃ সোম ওকে বাধা দিলেন না, দিতে পারলেন না। কিন্তু হঠাৎ যেন একটা অমঙ্গলের ইঙ্গিতে উনি ভয়ে কুঁকড়ে গেলেন।

পরের ছুটো দিন সব কাজই করলেন, তবু মনের মধ্যে অস্বস্তি থেকেই গেল। সাবিত্রী ছু-একবার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি কিছু হয়েছে ?

না, না, কিছু হয়নি।

মনে হচ্ছে সব সময় কী যেন ভাবছ।

মিঃ সোম একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমি আবার কী ভাবব ?

পরের দিন সকালে খবরের কাগজ হাতে নিয়েই মিঃ সোম চিৎকার করে উঠলেন, সাবি, অর্পিতা আত্মহত্যা করেছে।

ঐ খবরের কাগজখানা সামনে নিয়েই মিঃ সোম পুরো একটা দিন বোবা হয়ে বসে রইলেন। সাবিত্রী বার বার এলেন কিন্তু কিছুতেই সমবেদনা জানাতে পারলেন না। বিকেলের দিকে প্রবীরবাবু আর সুমিত্রা এলো, কিন্তু তারাও ওর সামনে গিয়ে বোবা হয়ে গেল।

খবর পেয়ে পরের দিন সকালে সুবীর নন্দিতা আর তুতুলকে নিয়ে হাজির হলো। ওরাও মিঃ সোমকে দেখে ভয়ে সরে এলো। শেষে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল তুতুল। মিঃ সোমের মুখখানা ধরে তুতুল বললো, নতুন দাছু, তুমি আমাকে ট্রামে চড়াবে না ?

মিঃ সোম তুতুলকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমি আর ম্যারেজ অফিসারের কাজ করব না। এখন থেকে রোজ আমি তোমাকে নিয়ে ট্রামে চড়ে বেড়াব।

পরের দিন সকালেই রেজেস্ট্রী করে মিঃ সোম ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিলেন। তারপর একদিন সরকারী অফিস থেকে সে ইস্তফাপত্র গৃহীত হবার খবরও এলো।

মিঃ সোম সুমিত্রাকে বললেন, দিদি, তোমাদের মত ভাইবোন, সুবীর-নন্দিতার মত ছেলেমেয়ে আর তুতুলের মত নাতি পেয়ে বোধহয় মনে মনে আরো লোভ হয়েছিল। তাই অর্পিতা আমাকে চরম শিক্ষা দিয়ে গেল। উনি খুব জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, না দিদি, ভগবান আমাকে অনেক দিয়েছেন। আর আমি কিছু চাই না।

সেদিন রবিবার। ওরা সবাই এসেছেন। ভিতরের ঘরে চা খেতে খেতে খুব জোর আড্ডা চলছে। হঠাৎ খুব জোরে কলিং বেল বাজতেই নন্দিতা উঠে গেল। ফিরে এসে মিঃ সোমকে বললো, মিঃ ম্যাথুজ এসেছেন।

ম্যাথুজ!

মিঃ সোম প্রায় ছুটে বাইরের ঘরে গেলেন। পিছন পিছন ওরা সবাই এলেন। ম্যাথুজ একা আসেন নি, সঙ্গে কান্তামা আর ছেলেও আছে।

হ্যালো মিঃ সোম। মিঃ ম্যাথুজ ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি বলেছিলাম না হনিমুনে গিয়েই কান্তামা প্রেগন্যান্ট হবে?

ম্যাথুজের কথায় সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন।